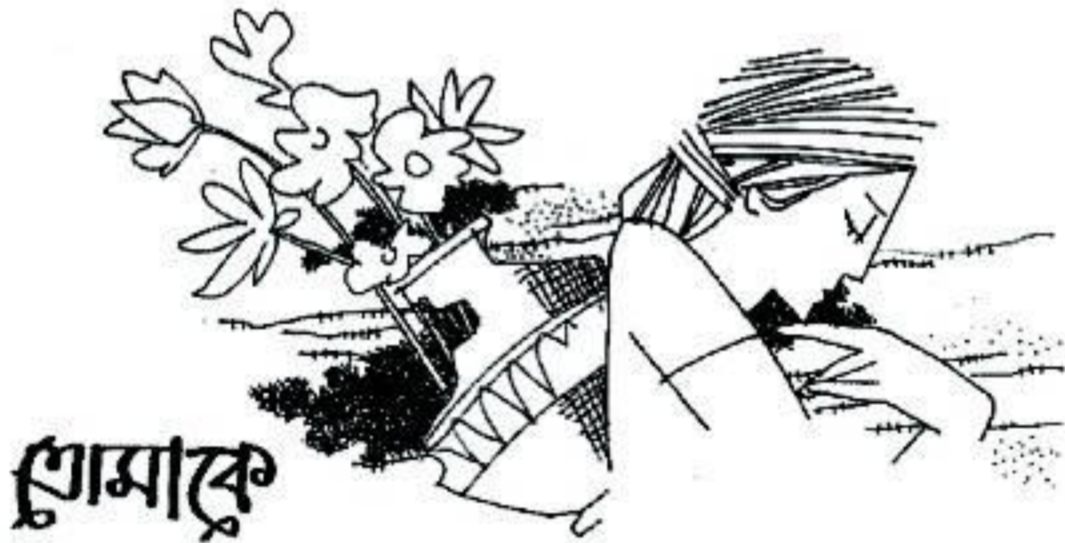
তোমাকে

হুমায়ূন আহমেদ





তোমাকে

১

নীলু বয়সে আমার চেয়ে এগারো মিনিটের বড়। তার জন্মের ঠিক এগারো মিনিট পর আমার জন্ম হয় এবং দারুণ একটা হৈচৈ শুরু হয়। ডাক্তার শমসের আলি অবাক হয়ে চেঁচিয়ে ওঠেন, আরে, যমজ বাচ্চা দেখি! ঠিক তখন ইলেকট্রিসিটি চলে গিয়ে চারদিক অন্ধকার হয়ে যায়। আমরা দুই বোন গলা ফাটিয়ে চিৎকার করতে থাকি। ডাক্তার শমসের আলি হারিকেনের জন্যে চেঁচাতে থাকেন। আমার নানিজান ছুটে ঘর থেকে বেরুতে গিয়ে পানির একটা গামলা উল্টে ফেলেন।

আমার জন্মের সময় চারদিক অন্ধকার হয়ে গিয়েছিল বলে বাবা আমার নাম রাখেন রাত্রি। নীলু জন্মের পরপর খুব কাঁদছিল, তাই তার নাম কান্না। এইসব কাব্যিক নাম অবশ্যি টিকল না। একজন হল নীলু। তার সাথে মিল রেখে আমি হলাম বিলু। তার চার বছর পর আমাদের তিন নম্বর বোনটি হল। মিল দিয়ে নাম রাখলে শুধু মেয়েই হতে থাকবে এইজন্যে তার নাম হল সেতারা। নীলু, বিলু এবং সেতারা।

বাবার রাখা নাম না টিকলেও বাবা কিন্তু হাল ছাড়লেন না। সুযোগ পেলেই চেঁচিয়ে ডাকতেন, কোথায় আমার বড় বেটি কান্না? কোথায় আমার মেজো বেটি রাত্রি?

জন্মদিনে বই উপহার দেবার সময় বইয়ের দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় গোটা গোটা হরফে লিখতেন, "মামণি রাত্রিকে ভালবাসার সহিত দিলাম" কিংবা "মামণি কান্নাকে পরম আদরের সহিত দেওয়া হইল"।

বইয়ের সঙ্গে সবসময় একটা করে তাঁর স্বরচিত কবিতা থাকত। সেই কবিতা তিনি তাঁর প্রেস থেকে ছাপিয়ে ফ্রেম করে বাঁধিয়ে আনতেন। আট বছরের জন্মদিনে আমি এবং নীলু যে কবিতাটি পেলাম সেটা শুরু হয়েছে এভাবে —

"সাতটি বছর গেল পর পর
আজকে পড়েছে আটে
তব জন্মদিন নয়তো মলিন
ভয়াল বিশ্বহাটে।
...   ..."

যমজ বোন বলেই আমরা দু'জন সবসময় একই কবিতা পেতাম। শুধু কবিতা নয়, গল্পের বইও একই হত। দু'জনের জন্যে দুটি "শিশু ভোলানাথ" কিংবা দুটি "ঠাকুরমার ঝুলি'।

আমরা দু'জন যে দেখতে অবিকল একরকম এ নিয়ে বাবার মধ্যে একটা গোপন গর্ব এবং অহঙ্কার ছিল। নতুন কেউ এলেই হাসিমুখে বলতেন — 'এরা যমজ। একজনের নাম রাত্রি, একজনের নাম কান্না। যার চুল ছোট ছোট ও হচ্ছে কান্না।' মা বড় বিরক্ত হতেন। ভুরু কুঁচকে বলতেন — যমজ মেয়ে নিয়ে এত ঢোল পেটানোর কী আছে? যমজ-ফমজ আমি দু'চক্ষে দেখতে পারি না, ছি!

আমাদের দুজনকে যাতে দেখতে একরকম না দেখায় এ জন্যে তাঁর চেষ্টার ত্রুটি ছিল না। আমার চুল কেটে ছোট ছোট করে দিলেন। একজনের গায়ের রং যেন অন্যজনের চেয়ে আলাদা হয় সে জন্যে নীলুকে সপ্তাহে তিন দিন কাঁচা হলুদ দিয়ে গোসল করাতে লাগলেন। কিছুতেই কিছু হল না। আমরা যতই বড় হতে থাকলাম আমাদের চেহারার মিল ততই বাড়তে লাগল। নীলু যেমন লম্বা আমিও তেমন লম্বা। তার চিবুকের নিচে যেরকম একটি লাল রঙের তিল আমারও অবিকল সেরকম তিল। তার যেমন শ্যামলা গায়ের রং আমার তাই। মা পর্যন্ত ভুল করতে লাগলেন । যেমন একদিন বারান্দায় বসে তেঁতুলের খোসা ছড়াচ্ছি, মা ঝড়ের মতো এসে প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

'এক খিলি পান দিতে বললাম কতক্ষণ আগে?'

আমি শান্ত স্বরে বললাম, 'আমাকে বলনি। বোধহয় নীলুকে বলেছ। আমি বিলু।'

আমার ছোট চুল যখন লম্বা হল তখন দেখা গেল বাবা এবং মা ছাড়া আমাদের কেউ আলাদা করতে পারে না। কেন পারে না সে-ও এক রহস্য। নীলুর সঙ্গে আমার বেশ কিছু অমিল আছে। যেমন নীলুর নাক একটুখানি চাপা। ওর চোখ দুটি একটুখানি উপরের দিকে ওঠানো। তবুও দোতলার নজমুল চাচা আমাদের দু'বোনকে যখনি দেখেন তখনি বলেন, 'কে কোন জন? কে কোন জন?' নীলু তাতে খুব মজা পায়। আমার অবশ্যি রাগ লাগে। এইসব আবার কী ঢং? নজমুল চাচা সবসময়ই ঢং করেন। মা নজমুল চাচাকে সহ্যই করতে পারেন না। নজমুল চাচার গলা শুনলেই মুখ কুঁচকে বলেন, 'ভাঁড় কোথাকার! সব- সময় ভাঁড়ামি।'

আমাদের নিয়ে সবচে বেশি ভাঁড়ামি করেন অবশ্যি আমার বড় মামা। দিনাজপুর

থেকে বেড়াতে এলেই মহা উৎসাহে আমাদের দু'জনকে সামনে বসিয়ে উঁচু গলায় বলেন, 'দেখা যাক আমি নীলু বিলুকে আলাদা করতে পারি কিনা। ওয়ান টু থ্রী — হুঁ, এইজন হচ্ছে আমাদের বিলুমণি।' বড় মামা ভাঁড়ামি করলে মা রাগ করতেন না, বরং একটু যেন খুশিই হতেন। সবচে খুশি হত নীলু। সে হেসে কুটিকুটি। নীলুর নাম কান্না না হয়ে ভালই হয়েছে। সে হাসতেই জানে, কাঁদতে জানে না। আমরা যখন ক্লাস সেভেনে উঠলাম নীলু আমার কাছ থেকে আলাদা হয়ে গেল তার হাসি নিয়ে। যা-ই দেখে তাতেই তার হাসি পায়। মা হয়তো কিছু নিয়ে ধমক দিয়েছেন। সে মুখ ফিরিয়ে হাসি গোপন করবার চেষ্টা করছে। মা কঠিন স্বরে বলছেন, 'হাসছ কেন তুমি?'

'কই, হাসছি না তো।'

'মুখ ফেরাও। তাকাও আমার দিকে।'

নীলু মুখ ফেরালে আমরা দেখতাম হাসি থামাবার চেষ্টায় তার গাল লালচে হয়ে উঠছে।

'কেন তুমি শুধু শুধু হাসছ? হাসির কী হয়েছে বলো তুমি, তোমাকে বলতে হবে।'

'আর হাসব না মা। এখন থেকে শুধু কাঁদব।'

বলেই সে আবার ফিক করে হেসে ফেলল। মা প্রচণ্ড একটা চড় কষালেন।

'বাঁদর কোথাকার! তোমার হাসি আমি ঘুচিয়ে দিচ্ছি দেখো।'

নীলুর চোখে জল আসছে কি না মা দেখতে চেষ্টা করতেন। কোথায় কী? নীলু এমনভাবে দাঁড়িয়ে আছে যেন কিছুই হয়নি। মা ক্লান্ত হয়ে বলতেন, 'ঠিক আছে, যাও আমার সামনে থেকে।'

নীলু এমনভাবে ছুটে যেত যেন আড়ালে গিয়ে হেসে বুক হালকা করবে। নীলুটা এমন হয়েছে কেন? এ বাড়িতে সবাই একটু গম্ভীর। সেতারা, যার বয়স মাত্র পাঁচ, সে পর্যন্ত কম কথা বলে। নীলু কার কাছ থেকে এত কথা বলা শিখল? কার কাছ থেকে অকারণে হাসার এই অদ্ভুত অসুখ জোগাড় করল?

আমার এবং নীলুর খাট দক্ষিণ দিকের বড় ঘরটায়। নীলু ঘুমায় সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে। তার একা একা ভয় করে। আকবরের মা ঘুমায় বারান্দায়। আমরা ডাকাডাকি করলে তার উঠে আসার কথা। সে একবার ঘুমালে নিশ্চিন্ত। সারা রাতে এক সেকেণ্ডের জন্যেও জাগবে না। এগ্নিতে অবশ্যি বলবে, 'ভইন, আমার সজাগ ঘুম। ইট্টু শব্দ হইলেই চউখ খোলা।' আকবরের মা কোনো কাজ ঠিকমত করতে পারে না। প্রচুর মিথ্যা কথা বলে। অনেকবার তাকে বিদায় দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, লাভ হয়নি কিছু। সে ঘাড় বাঁকিয়ে বলেছে, 'যাইতাম না। দেহি কেমনে বিদায় দেয়। তামশা না? এই বুড়া বয়সে যাইতাম কই?'

আকবরের মা রাতে ভাতটাত খেয়ে ঘুমাতে এসে জিজ্ঞেস করে, 'কইগো মাইয়ারা, ভূতের কিচ্ছা হুনতে চাও?' নীলু ভীতু, সে শুনবে না, কিন্তু যেহেতু আমি শুনি কাজেই তাকেও শুনতে হয়।

'আকবরের বাপের গপটা কই। শইলের মইধ্যের লোম খাড়া হইয়া যায়, বুঝছনি মাইয়ারা। শীতের সময়। খুব জার। আকবরের বাপের মাছ মারতে যাওনের কথা। আমারে কইল, তামুক দে . . .'

নীলু গল্পের মাঝখানে জিজ্ঞেস করে, 'তুই করে বলত?'

'তা ঠিক। গরিব মাইনষের কথাবার্তা তুই-তুকারি দিয়া।'

আকবরের মা'র ভাষা ঠিক বোঝা না গেলেও গল্প ধরতে কোনো অসুবিধে হয় না। সব গল্পের শেষে আকবরের বাবা। যার সাহসের কোন সীমা নেই, একটা ভূতের গলা জাপ্টে ধরে কুমড়ো গড়াগড়ি করবে। এবং সবশেষে ভূতটা জঙ্গল ভেঙে ছুটে যাবে। যাবার সময় বলবে, 'এঁই বাঁর ছাঁইরা দিলাম। বুঁঝছস? জাঁনে বাঁচলি।'

গল্প শেষ হলেই নীলু বলবে, 'দূর, ভূত আবার আছে নাকি?'

আকবরের মা চোখ কপালে তুলে বলবে, 'এইটা কেমুন বেকুবের মতো কথা কইলা? দেশটা ভর্তি ভূত আর পেত্নীতে। আমার সাথে একবার যাইও আমরার নীলগঞ্জের বাড়িত। নিজের চউক্ষে ভূত দেখবা।'

আকবরের মা শুধু যে আমাদের ভূতের গল্প শোনাবার চেষ্টা করে তাই না, মাকেও শোনাতে চেষ্টা করে। সুযোগ পেলেই একটা গল্প টেনে আনতে চায়, 'বুঝছেন আম্মা, একবার হইল কি . . .।' মা এক ধমক দিয়ে থামিয়ে দেন। আজেবাজে গল্প মা একেবারেই সহ্য করতে পারেন না। শুধু আকবরের মা নয়, বাবাকেও এমনিভাবে থামান হয়, 'যা বলতে চাও সরাসরি বলতে পার না? এত ফেনাও কেন?'

'ফেনাই নাকি?'

'হ্যাঁ, ফেনাও। বেশি রকম ফেনাও। যা বলার তা সহজভাবে বলতে পারা উচিত।'

'ও।'

'রাগ করলে নাকি আবার?'

'না। আমি এত সহজে রাগ করি না।'

বাবার এই কথাটি খুব সত্যি। বাবা রাগ করতে পারেন না। নীলুর ধারণা বাবা মোটা বলেই রাগ করতে জানেন না। মোটা মানুষদের এই একটা বড় অসুবিধে। কথাটা হয়তো সত্যি। আমাদের স্কুলের মোটা আপাগুলিকে কিছুতেই রাগানো যায় না। আর চিকনা আপাগুলি কারণ ছাড়াই চিড়বিড় করছে। আমাদের মা নিজেও রোগা বলেই বোধহয় তাঁর রাগ বেশি। তিনি রাগেন না শুধু আমাদের প্রেসের ম্যানেজারবাবুর সঙ্গে। তাঁর নাম প্রণব বসু। এঁর অনেক রকম গুণ আছে। চমৎকার গান গাইতে পারেন, এবং চমৎকার গল্প করতে পারেন। তারচে বড় কথা, চমৎকার রসিকতা করতে পারেন। এবং রসিকতাগুলি করেন গম্ভীরমুখে।

যেমন একদিন নীলুকে বললেন, 'এই নীলু, কাল কী হয়েছে জানিস?'

'না তো, কী হয়েছে?'

'উচ্চাঙ্গ সঙ্গীতের যে ওস্তাদ আছেন মুনসি মীর আলি, তিনি কাল জিলা স্কুলের মাঠে রাগ জয়-জয়ন্তী গেয়ে দুটি মেডেল পেয়েছেন। একটা বড় মেডেল। একটা ছোট মেডেল। ছোটটা পেয়েছেন গান গাওয়ার জন্যে আর বড়টা গান থামানোর জন্যে।'

প্রণববাবুকে আমরা ডাকি ম্যানেজার কাকু। মা ডাকেন ম্যানেজার। বাবা ডাকেন "বোস"। ভাল কিছু রান্নাটান্না হলে বাবা বলবেন, 'দেখি, বোসকে একটা খবর দাও তো। খাওয়াদাওয়ার পর একটু গান-বাজনা হবে।'

ম্যানেজার কাকু অবশ্যি সহজে গান-বাজনা করেন না। তবে যদি ধরে-বেঁধে একবার বসানো যায় তখন গান চলে গভীর রাত পর্যন্ত। আমরা অবশ্যি এত রাত পর্যন্ত থাকতে পারি না। ধমক দিয়ে মা আমাদের নিচে পাঠিয়ে দেন। তবে অনেক রাত পর্যন্ত আমরা

জেগে থেকে গান শুনি। আমার নিজের গান শেখার খুবই শখ। মাকে বেশ কয়েকবার বলাতে মা ম্যানেজার কাকুকে বললেন, 'ওদের একটু গান শেখান—না।'

ম্যানেজার কাকু গম্ভীর গলায় বললেন, 'বৌদি, ওদের বয়স কম।'

'কম বয়স থেকেই তো শুনেছি গান—বাজনা শুরু করতে হয়।'

'উঁহু, সংগীতের জন্যে মমতা ছাড়া কিছু হয় না। সেই মমতাটা অল্প বয়সে হয় না। আপনি যদি শিখতে চান শেখাতে পারি।'

'রক্ষা করো, এই বয়সে আর আঁ—আঁ করতে পারব না।'

ম্যানেজার কাকুকে একমাত্র নীলু ছাড়া আমরা সবাই বেশ পছন্দ করি। নীলু যদিও ম্যানেজার কাকুর রসিকতায় সবচে উঁচু গলায় হাসে, কিন্তু আড়ালে বলে, 'আমার ম্যানেজার কাকুকে ভাল লাগে না।'

'কেন, ভাল না—লাগার কী আছে?'

'আছে একটা-কিছু। আমি জানি না কী।'

নীলু মাঝে মাঝে এলোমেলো কথাবার্তা বলে এবং সেগুলি সত্যি হয়ে যায়। সেতারা যেদিন সিঁড়ি থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে সেদিন সকালবেলাতেই নীলু বলেছে, 'আমি রাতে স্বপ্ন দেখেছি সেতারা খাট থেকে পড়ে গিয়ে পা ভেঙে ফেলেছে।' ম্যানেজার কাকু প্রসঙ্গেও নীলুর আশঙ্কা সত্যি হয়ে গেল।

আমরা স্কুলে গিয়েছি। থার্ড পিরিয়ডে জিওগ্রাফি আপা এসে বললেন, 'নীলু বিলু, তোমরা দু'জন বাসায় যাও তো, তোমাদের নিতে এসেছে।' আমরা অবাক হয়ে বাসায় এসে দেখি আকবরের মা সেতারাকে ঘুম পাড়াচ্ছে, বাসায় মা—বাবা কেউ নেই। দোতলার নজমুল চাচা শুধু বসার ঘরে মুখ কালো করে বসে আছেন। আমরা কিছুক্ষণের মধ্যেই একটা অদ্ভুত কথা শুনলাম। মা নাকি ম্যানেজার কাকুর সঙ্গে কোথায় চলে গেছেন। আর আসবেন না — এরকম একটা চিঠি লিখে গেছেন।

বাবা ফিরলেন রাত এগারোটায়। আমরা জেগে বসে আছি। অনেক লোকজন এসেছে। কেউ যাচ্ছে না। সবাই গম্ভীর মুখে বসে আছেন বসবার ঘরে। বাবা ঘরে ঢুকে এমন ভাব করলেন যেন কিছুই হয়নি। হাসিমুখে বললেন, 'রেণু ঝগড়া করে সকালের ট্রেনে দিনাজপুর তার বাবার বাড়ি চলে গেছে। আমি ছিলাম না। ভাগ্যিস প্রণববাবু বুদ্ধি করে সঙ্গে গেছেন। নয় তো একা একা মেয়েছেলে এতদূর যাবে, দেখেন—না অবস্থাটা, এই মেয়েজাতটার মতো রাগ আর কারোর নেই। হা—হা—হা। এদের নিয়েও চলে না, না নিয়েও চলে না।'

লোকজন সব বারোটার মধ্যে চলে গেল। আমরা নিজেদের ঘরে চুপচাপ শুয়ে ছিলাম। বাবা এসে ঘরে ঢুকলেন।

'মামণিরা ঘুমাচ্ছ?'

আমরা কেউ জবাব দিলাম না। বাবা মৃদু স্বরে বললেন, 'আজ রাতে তোমরা আমার সঙ্গে ঘুমাবে মামণিরা?'

নীলু শব্দ করে কেঁদে উঠল।

সে সময় আমার এবং নীলুর বয়স বারো, সেতারার সাত।

মা চলে গিয়েছেন এবং আর কোনোদিন ফিরে আসবেন না — এটা আমরা খুব সহজেই বুঝে ফেললাম। শুধু সেতারা বুঝতে চাইল না। সে এম্নিতেই কম কথা বলে। এখন কথাবার্তা পুরোপুরিই বন্ধ করে দিল। দিনরাত সে শুধু মাকে খুঁজত। মা'র শোবার ঘরের সামনে কতবার যে গিয়ে দাঁড়াত! ডাকাডাকি না, কিছু না, শুধু দরজার সামনে চুপচাপ দাঁড়িয়ে থাকা। আমি একদিন দেখতে পেয়ে ডাকলাম, 'এই সেতারা।'

'উঁ।'

'এখানে একা একা দাঁড়িয়ে আছিস কেন?'

সেতারা মাথাটা অনেকখানি নিচু করে ফেলল, যেন খুব-একটা অপরাধ করেছে।

'কী করছিস তুই?'

'কিছু না।'

'আয় আমার সাথে, নদীর পাড়ে কিছুক্ষণ হাঁটাহাঁটি করব, আসবি?'

'না।'

আমি লক্ষ করি সে একা একা ঘুরে বেড়াতে চায়। কারো সঙ্গে থাকতে চায় না। সন্ধ্যাবেলা কেউ কিছু বলার আগেই সে 'আমার সাথী' বই নিয়ে বসে একমনে নিচু স্বরে পড়তে থাকে —

'কমলা ফুলি কমলা ফুলি
কমলা লেবুর ফুল
কমলা ফুলির বিয়ে হবে
কানে মোতির দুল।'

যখনি সে পড়তে বসে এই একটি কবিতাই সে পড়ে। তখন যদি বাড়ির সামনে কোনো রিকশা এসে থামে সে পড়া বন্ধ করে চোখ বড় বড় করে তাকিয়ে থাকে। একসময় বই বন্ধ করে অপরাধীর মতো আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। নিঃশব্দে চলে যায় বারান্দায়। আবার ফিরে এসে পড়তে বসে — কমলা ফুলি কমলা ফুলি কমলা লেবুর ফুল. . .।

একদিন নীলু বলল, 'সেতারা, মা আমাদের কাউকে পছন্দ করেন না তো তাই চলে গেছেন। আর আসবেন না।'

'আচ্ছা।'

'যে আমাদের ভালবাসে না আমরাও তাকে ভালবাসি না — ঠিক না?'

'হুঁ।'

'তুই আর মাকে খুঁজবি না — আচ্ছা?'

সেতারা মৃদু স্বরে বলল, 'আমাদের পছন্দ করে না কেন?'

'আমরা সবাই তো মেয়ে, এইজন্যে, ছেলে হলে পছন্দ হত। আমাদের তো কোনো ভাই নেই। বুঝেছিস?'

'হুঁ।'

সেতারা মায়ের আদর পায়নি বললেই হয়। তার জন্মের পরপর মা অসুস্থ হয়ে পড়েন। সেতারা বড় হতে থাকে আকবরের মা'র কোলে। মা'র অসুখ যখন সারল তখনো

অবস্থার পরিবর্তন হল না। মা মাঝে মাঝেই বিরক্ত স্বরে বলতে লাগলেন, 'ঘর ভর্তি হয়ে যাচ্ছে মেয়ে দিয়ে, ভাল লাগে না।' সেতারা যখন হাঁটতে শিখল টুকটুক করে হাঁটত। মায়ের ঘরে গিয়ে দাঁড়াত সুযোগ পেলেই। মা গম্ভীর গলায় ডাকতেন, 'আকবরের মা, ওকে নিয়ে যাও তো, এখুনি ঘর নোংরা করবে।' তার দু'বছর বয়স হতেই মা ওকে পাঠিয়ে দিলেন আমাদের ঘরে। রাতে ঘুমাবে নীলুর সঙ্গে। দুধ খাবার জন্যে কাঁদলে আকবরের মা উঠে দুধ বানিয়ে দেবে। সেতারা তখন কোনো ঝামেলা করেনি। এখনো করে না। নীলুর গলা জড়িয়ে ঘুমায়। নীলু বলে, 'গল্প শুনবি?'

'বলো।'

'এক দেশে ছিল এক রাজা। তার দুই রানি দুয়ো ও সুয়ো . . .'

এই পর্যন্ত আসতেই সেতারার চোখ বুজে আসে। কোনোদিন আর সে গল্প শেষ পর্যন্ত শোনা হয় না।

ইদানীং বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে ঘুমাতে চান। সেতারাও বেশ ভালমানুষের মতো যায়। কিন্তু মাঝরাতে একা একা চলে আসে আমাদের ঘরে। রোজ এই কাণ্ড! এক রাতে অদ্ভুত একটা ব্যাপার ঘটল। সেতারা সবাইকে ডাকতে লাগল, 'মা এসেছে রিকশা নিয়ে।' আমরা ধড়মড় করে উঠে বসলাম, 'কোথায়?'

'বারান্দায় দাঁড়িয়ে দেখলাম।'

'বলিস কী!'

হৈচৈ শুনে বাবা উঠে এলেন। কোথায় কী, খাঁ-খাঁ করছে চারদিক! সেতারা দারুণ অবাক হল। বাবা বললেন, 'স্বপ্ন দেখেছ মা।'

'উঁহু, স্বপ্ন না। আমি দেখলাম।'

সেতারা চোখ বড় বড় করে সবার দিকে তাকাতে লাগল। সে ব্যাপারটা কিছুই বুঝতে পারছে না। বাবা সেতারাকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলেন। সে রাতে আমি এবং নীলু এক খাটে ঘুমাতে গেলাম, এবং অনেক রাত পর্যন্ত দু'জনেই নিঃশব্দে কাঁদলাম। অথচ দু'জনই এমন ভাব করতে লাগলাম যেন ঘুমিয়ে পড়েছি।

৩

ধীরে ধীরে অনেকগুলি পরিবর্তন ঘটল বাড়িতে। বাবা অত্যন্ত বুদ্ধিমান ছিলেন। তিনি পরিবর্তনগুলি করলেন খুব সাবধানে। একদিন স্কুল থেকে ফিরে এসে দেখি মা'র আলনায় কোনো কাপড় নেই। সব বাবা কোথায় সরিয়ে ফেলেছেন। তার দিন সাতেক পর বারান্দায় মা'র যে বড় বাঁধাই-করা ছবিটি ছিল সেটিকে আর দেখা গেল না। বাবা-মা'র শোবার ঘরে তাদের বেশ কয়েকটি ছবি ছিল, সেগুলিও সরান হল।

আমাদের ঘরে মা-বাবা এবং আমাদের তিনজনের যে ছবিটি ছিল সেটি শুধু বাবা সরালেন না। রান্নাবান্না করবার জন্যে রমজান নামের একজন বুড়ো মানুষ রাখা হল। এই লোকটি এসেই প্রচণ্ড ঝগড়া শুরু করল আকবরের মা'র সঙ্গে। দু'জনেরই কী ঝাঁজাল কথাবার্তা! কিন্তু রমজান লোকটি ভাল। সে সেতারাকে কোলে নিয়ে ঘুরে ঘুরে ভাত খাওয়াত। আমাদের উপর তার খবরদারিরও সীমা ছিল না।

'এই সইন্ধ্যা রাইতে বাগানো ঘুরাঘুরি করন ঠিক না।'

'অত তেঁতুল খাওন বালা না, বুদ্ধি নষ্ট হয়।'

'ভাত খাওনের আগে বিসমিল্লাহ কইরা এট্টু লবণ মুখের মইধ্যে দেওন দরকার।'

রাতের বেলা খাওয়া দাওয়া শেষ হলে সে গম্ভীর হয়ে একটা খবরের কাগজ নিয়ে আমাদের পড়ার ঘরে গিয়ে বসত। খবরের কাগজ পড়তে পড়তে এমন সব কথাবার্তা বলত যে নীলু হেসে উঠত খিলখিল করে।

'হুঁ খুব সংকটময় অবস্থা। বুঝছ নীলু আপা, অবস্থা সংকটময়।'

'কেন?'

'নেপালে পাহাড়ী ঢল। হুঁ।'

এই অবস্থায় ঝগড়া লেগে যেত আকবরের মা'র সঙ্গে। আকবরের মা কোমরে দুই হাত দিয়ে রণরঙ্গিণী মূর্তিতে এসে দাঁড়াত।

'বিদ্যার জাহাজ যে বইছেন, পাকঘরের বাসনডি কেডা ধুইব?'

'চুপ থাক। অশিক্ষিত মূর্খ মেয়েমানুষ, এদের নিয়া চলাফেরা মুশকিল।'

রমজান ছাড়াও একজন ভয়ংকর রোগা দাঁত নেই ওস্তাদ রাখা হল। এই ওস্তাদটির নাম মুনশি সোভাহান। তিনি আমাদের তিন বোনকে সপ্তাহে তিন দিন গান শেখাবেন। আমরা তিন জনেই গান শিখতে শুরু করলাম। সকালবেলা হারমোনিয়াম নিয়ে বসে "সারেগা রেগামা গামাপা"। খুবই বিরক্তিকর ব্যাপার। ওস্তাদ সোভাহান বেশিক্ষণ গান শেখাতে পারেন না। কিছুক্ষণের মধ্যেই তার হাঁপানির টান ওঠে। গান থামিয়ে বলেন, 'ঘরে কোনো টিফিন আছে কি না দেখো তো খুকি। না থাকলে একটা মুরগির ডিম ভেজে দিতে বলো। হাঁসের ডিম না। হাঁসের ডিম গন্ধ করে, খেতে পারি না।'

গানের উপর থেকে আমার মন উঠে গিয়েছিল, কাজেই আমাকে দিয়ে গান হল না। সেতারা এবং নীলু শিখতে লাগল। কিছুদিন পর নীলুও কেটে পড়ল। রইল শুধু সেতারা। মাস ছয়েকের মধ্যে দেখা গেল বেণী দুলিয়ে হারমোনিয়াম বাজিয়ে সেতারা গাইছে, 'নবীর দুলালী মেয়ে খেলে মদিনায়। ও ও ও খেলে মদিনায়।'

ওস্তাদ সোভাহান ঘাড়-টাড় দুলিয়ে বলেছেন, 'মারহাবা মারহাবা কী টনটনে গলা! এইবার লক্ষ্মী ময়না গিয়ে দেখো তো কোনো টিফিন আছে কি না। না থাকলে মধুর দোকান থেকে যেন একটা অমৃতি নিয়ে আসে। আর চা দিতে বলো।'

৪

সে বছর শীতের সময় মা আমাদের তিন বোনকে সিরাজগঞ্জ থেকে আলাদা আলাদা চিঠি লিখলেন। বাবা একদিন সন্ধ্যায় পাংশুমুখে তিনটি খামে-বন্ধ চিঠি নিয়ে আমাদের ঘরে এসে দাঁড়ালেন। কাঁপা গলায় বললেন, 'তোমাদের মা চিঠি লিখেছেন। তোমরা কি সেই চিঠি পড়তে চাও?'

বাবার গলা কাঁপছিল। আমি পরিষ্কার বুঝতে পারলাম বাবা চাচ্ছেন আমরা বলি, 'না।' বাবা কপালের ঘাম মুছে নিচু স্বরে বললেন, 'আমরা সবাই তাকে ভুলতে চেষ্টা করছি। এখন আবার চিঠিপত্র শুরু করলে কষ্ট হবে। নতুন করে কষ্ট হবে।'

বাবা থামতেই সেতারা বলল, 'আমার চিঠি দাও।' খানিকক্ষণ চুপ থেকে নীলুও

বলল, 'আমার চিঠিটাও দাও।' শুধু আমি কিছু বললাম না। বাবা ধরা গলায় বললেন, 'মামণি রাত্রি, তোমারটা?'

'আমি চাই না।'

কী লেখা ছিল নীলু এবং সেতারার চিঠিতে আমি জানি না। নীলু সমস্ত কথাই আমাকে বলে। শুধু চিঠির ব্যাপারে কিছু বলল না। আর সেতারা তো তার খামই খুলল না। বন্ধ খাম হাতে নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগল।

আমি বললাম, 'খুলে দেব?'

'না।'

'না খুললে পড়বি কী করে?'

'আমি পরে পড়ব।'

যেন পড়লেই চিঠির মজা শেষ হয়ে যাবে। আমি সমস্ত দিন ভাবলাম কী লিখেছেন মা চিঠিতে? ক্লাসে আপারা কী পড়ালেন কিছুই বুঝতে পারলাম না। অঙ্ক আপা দু'বার ধমক দিলেন, 'এই বিলু, তোমার পড়ায় আজকে মন নেই, কী ব্যাপার?'

'কিছু না আপা।'

'আমি কী বলছি তুমি তো কিছুই শুনছ না।'

'শুনছি আপা।'

'না, শুনছ না। বলো তো আমি কি বলছিলাম?'

আমি বলতে পারলাম না। সব মেয়েরা হেসে গড়িয়ে পড়তে লাগল। আমার ক্লাসের মেয়েরা বিচিত্র কারণে আমাকে অপছন্দ করে। সবসময় আমার পেছনে লেগে থাকে। আমাদের বাথরুমের দেয়ালে আমাকে নিয়ে অনেক কথাবার্তা লেখা। একটা নেংটা মেয়ে এবং ছেলের ছবিও আঁকা আছে। মেয়েটার গায়ে লেখা — বিলু ক্লাস নাইন খ শাখা। অথচ কোথাও নীলুর নামে কিছু লেখা নেই। আমি কখনো বাথরুমে যাই না। যদি যেতেই হয় তা হলে অনেকক্ষণ সেখানে বসে কাঁদি। ইরেজার দিয়ে লেখাগুলি তুলে ফেলতে চেষ্টা করি — কিছুতেই সেগুলি ওঠানো যায় না।

'বিলু, মন দিয়ে পড়াশুনা করবে, বুঝলে। এরকম করলে তো হবে না।'

ক্লাসের মেয়েগুলি আবার হৈচৈ করে হেসে উঠল। বাড়িতে ফিরে এসে অনেকক্ষণ একা একা বসে রইলাম। রাতে রমজান ভাইকে বলে দিলাম, 'খিদে নেই কিছু খাব না।' অনেক রাতে ঘুমাতে গিয়ে দেখি আমার বালিশের নিচে মায়ের পাঠানো খামটা রেখে দেয়া। নিশ্চয়ই বাবার কাণ্ড!

ঘরে কেউ নেই। নীলু এখনো পড়ছে। সেতারা রান্নাঘরে রমজান ভাইয়ের সঙ্গে কী যেন করছে। আমি দরজা বন্ধ করে খাম খুলে ফেললাম। মা আমাকে বিলু নামে সম্বোধন করেন নি, প্রথমবারের মতো লিখেছেন — রাত্রি।

> মামণি রাত্রি,
>
> জানি প্রচণ্ড রাগ করেছ তুমি। কিন্তু কী করব মা, উপায় ছিল না। তুমি যখন বড় হবে তখন বুঝবে। মানুষের মন খুব বিচিত্র জিনিস। একবার কোনো কিছুতে মন বসে গেলে তা ফেরানো যায় না। আমি বহু চেষ্টা করেছি। মানুষ হয়ে জন্মানোর মতো কষ্টের কিছু নেই। আমি তোমাদের ছেড়েছুঁড়ে এসেছি,

তবু রাতদিন তোমাদের কথাই ভাবি। রাতদিন প্রার্থনা করি, যে কষ্ট আমি পাচ্ছি তা যেন কখনো আমার মামণিদের না হয়।

তোমার মা

৫

থার্ড পিরিয়ডে অঙ্ক আপা ক্লাসে ঢুকেই বললেন, 'বিলু, ক্লাসশেষে আজ তুমি আমার সঙ্গে দেখা করবে।'

আমার মনটা খারাপ হয়ে গেল। অঙ্ক আপা আজেবাজে প্রশ্ন করেন। কয়েকদিন আগে হাফ টাইমের সময় অংক আপার সঙ্গে দেখা। আপা আমাকে আড়ালে ডেকে নিয়ে বললেন, 'তোমার মা শুনলাম ঐ লোকটার সঙ্গে ইন্ডিয়া চলে গেছে, সত্যি নাকি?'

'না, সত্যি না।'

'কোথায় আছে তা হলে?'

আমি চুপ করে রইলাম।

আপা গলা নিচু করে বললেন, 'বলতে পার না, না?'

'সিরাজগঞ্জে আছেন।'

'ও। বাচ্চাকাচ্চা হয়েছে নাকি?'

'আমি জানি না আপা।'

'আমাকে কে যেন বলল একটা ছেলে হয়েছে।'

আমার নিজের ধারণা, মেয়েদের মতো হৃদয়হীন পুরুষরা হতে পারে না। ছেলেরা কেউ এখনো আমাকে আমার মা প্রসঙ্গে কিছু জিজ্ঞেস করেনি। অথচ চেনাজানা মেয়েদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে কিছু জানতে চায়নি।

ক্লাসের বন্ধুদের কথা বাদই দিই, বন্ধুদের মা-খালাদের পর্যন্ত কৌতূহলের সীমা নেই। কোনো-না কোনো ভাবে টেনেটুনে ঐ প্রসঙ্গ আনবেই।

'বিলু, তোমরা আগে কিছু টের পাওনি? আগেই তো টের পাওয়া উচিত।'

'তোমার মা নাকি যাবার আগে বহু টাকাপয়সা নিয়ে গেছে?'

মা গিয়েছেন প্রায় দু'বছর আগে। এখনো কেউ সেটা ভুলতে পারে না কেন কে জানে?

অঙ্ক ক্লাসটা আমার খুব খারাপভাবে কাটল। ক্লাস শেষ হওয়া মাত্র গেলাম আপার কাছে। আপার নিজের কোনো ঘর নেই। কমন রুমে একগাদা টীচারের সঙ্গে বসে আছেন। তিনি আমাকে আড়ালে নিয়ে গিয়ে বললেন, 'তোমাদের বাড়িতে বয়স্ক মহিলা কেউ নেই?'

'কাজের একটি মেয়ে আছে — আকবরের মা।'

'সে ছাড়া কেউ নেই?'

'জ্বি না আপা। কেন?'

'তোমরা তো বড় হচ্ছ এখন, কিছু কিছু জিনিস তোমাদের বলা দরকার। কেউ বলছে না তাই তোমাকে ডাকালাম।'

আমি আড়ষ্ট হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম। আপা খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বললেন, 'বিলু,

তোমার এবং নীলুর দু'জনেরই এখন ব্রা পরা উচিত।'

আমি চোখমুখ লাল করে দাঁড়িয়ে রইলাম।

'তোমার বাবাকে বলবে কিনে দিতে। বাবাকে বলার মধ্যে লজ্জার কিছু নেই। আর যদি লজ্জা লাগে তাঁকে আমি একটি চিঠি লিখে দিতে পারি।'

'দিন, একটা চিঠি লিখে দিন।'

'ঠিক আছে, ক্লাস ছুটির পর চিঠি নিয়ে যেও। আরেকটি কথা, নীলু মোটেই পড়াশোনা করে না। তোমার বাবাকে বলবে কোনো প্রাইভেট টীচার রেখে দিতে। অঙ্কে সে খুব কাঁচা। অঙ্ক জানে না বললেই হয়।'

'আপা, আমি বলব।'

'ঠিক আছে, তুমি যাও এখন। এইসব বললাম দেখে কিছু মনে করনি তো?'

'জ্বি না।'

'মনে হচ্ছে তুমি আমার ওপর রাগ করেছ। রাগ করার কিছু নেই বিলু। তোমাকে আমি খুব পছন্দ করি। এত ঝামেলার মধ্যেও যে মেয়ে প্রতি বিষয়ে সবচে' বেশি নম্বর পায় তার প্রশংসা তো করতেই হয়।'

অঙ্ক আপা একটু হাসলেন।

'বিলু!'

'জ্বি।'

'কখনো কোনো অসুবিধা হলে আমাকে বলবে।'

'ঠিক আছে আপা, বলব।'

'শোনো আরেকটা কথা। ইয়ে, কী যেন বলে তোমার বাবা নাকি আবার বিয়ে করছেন?'

'জ্বি না।'

'তুমি বোধহয় জান না। বাবার বিয়ের কথা তো মেয়েদের জানার কথা নয়।'

বাবার বিয়ের কথা কিছুদিন থেকেই শোনা যাচ্ছে। দিনাজপুর থেকে বড় মামা এসেছিলেন। তিনি পর্যন্ত নীলুকে আড়ালে ডেকে জিজ্ঞেস করেছেন, 'দুলাভাই নাকি বিয়ে করছেন?' নীলু তার স্বভাবমত হেসে ভেঙে পড়েছে।

'হাসছিস কেন?'

'হাসির কথা বললে হাসব না মামা?'

'আমি কি হাসির কথা বললাম নাকি? বিয়ে করলে তোদের অবস্থাটা কী হবে ভেবেছিস?'

'কী আর হবে! আমার তো মনে হয় ভালই হবে। কথা বলার একজন লোক পাওয়া যাবে।'

'কথা বলার লোকের তোর অভাব?'

'হ্যাঁ মামা। বিলুর সঙ্গে কি আর সব কথা বলা যায়? মা-জাতীয় একজন কেউ লাগে। বাবা বিয়ে করলে ভাল হয় মামা।'

'করছেন নাকি?'

'জানি না মামা। তবে দোতলার নজমুল চাচা একদিন আমাকে জিজ্ঞেস করলেন, তোমার বাবা এখন একটা বিয়ে করলে মনে হয় সংসার স্বাভাবিক হয়।'

'তুই কী বললি?'

'আমি বললাম, তা তো ঠিকই।'

মামা গম্ভীর হয়ে পড়লেন। নীলু বলল, 'তারপর একদিন এক বুড়োমত ভদ্রলোক এসে বাড়িটাড়ি ঘুরেটুরে দেখলেন। মা'র সঙ্গে বাবার সম্পর্ক কী রকম ছিল জিজ্ঞেস-টিজ্ঞেস করলেন।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ মামা, বিয়ে বোধহয় লেগে যাচ্ছে।'

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল। আমি নিজেও অবাক হলাম। এসব কিছুই আমি জানি না। নীলু আজকাল অনেক কথাই আমাকে বলে না। প্রায়ই সে তার বান্ধবীর বাড়ি যাচ্ছে। হঠাৎ করে তার সঙ্গে এত খাতির হল কেন — জিজ্ঞেস করাতে সে গা এলিয়ে হেসেছে। এ বাড়ির সবাই বদলে যাচ্ছে। বাবা বদলেছেন সবচে বেশি। আমাদের জন্মদিন গেল জুন মাসের দশ তারিখ। বাবা কোনো কবিতা লিখলেন না। কয়েকদিন আগে দেখলাম সেতারাকে কী জন্যে যেন ধমকাচ্ছেন। সেতারা অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে। বাবার এরকম আচরণ তার কাছে সম্পূর্ণ নতুন। বাড়িও ফিরছেন আজকাল অনেক রাতে। গতকাল বাড়ি ফিরলেন সাড়ে এগারোটার দিকে। আমি জেগে বসে ছিলাম। বাবা বিরক্ত হয়ে বললেন, 'এত রাত পর্যন্ত জেগে বসে আছ কেন? আর থাকবে না। দশটা বাজতেই ঘুমাতে যাবে।'

আমি শান্ত স্বরে বললাম, 'তুমি আমার সঙ্গে এত রেগে রেগে কথা বলছ কেন?'

'রেগে রেগে কথা বলছি নাকি?'

আমি উত্তর না দিয়ে নিজের ঘরে চলে এলাম। বাবা খাওয়াদাওয়ার পর আমার ঘরের পাশের জানালার ধারে এসে দাঁড়িয়ে ডাকলেন, 'এই বিলু, বিলু।' আমি ঘুমের ভান করে পড়ে রইলাম। বাবা বেশ খানিকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থেকে চলে গেলেন।

বাবা এরকম ছিলেন না, বাবা বদলে যাচ্ছেন। নীলু তো বদলেই গেছে। আমি নিজেও বোধহয় বদলাচ্ছি। একা একা থাকতে ইচ্ছে করে। সেদিন খুব ঝগড়া করলাম নীলুর সঙ্গে। আমি মাঝে মাঝে অচেনা সব মানুষদের মন-গড়া চিঠি লিখি, নীলু সেটা জানে। তবু সে একটা চিঠি হাতে নিয়ে হাসতে হাসতে বলল, 'প্রেমপত্র নাকি রে?' তারপর মুখ বাকা করে পড়তে শুরু করল —'আপনাকে একটি কথা বলা হয়নি। এখন শ্রাবণ মাস তো, তাই খুব বৃষ্টি হচ্ছে। রাতদিন ঝমঝম বৃষ্টি।' নীলু বহু কষ্টে হাসি থামিয়ে বলল, শ্রাবণ মাস কোথায় রে, এটা তো আশ্বিন মাস! তোর মাথাটাই খারাপ। হি-হি-হি।' আমি চিঠি কেড়ে নিয়ে নীলুর গালে একটা চড় কষিয়ে দিলাম। নীলু দারুণ অবাক হয়ে গেল। আমি এরকম ছিলাম না।

বাবা বিয়ে করলে সংসার স্বাভাবিক হলে তো ভালই হয়। নীলু ঠিকই বলেছে, সব বাড়িতে মা-জাতীয় একজন কেউ দরকার। সে সময়মত মেয়েদের ব্রা কিনে দেবে।

কিন্তু আমার বড় মামা সেদিকটা দেখছেন না। তাঁর ভাবভঙ্গি দেখে মনে হচ্ছে খুব খারাপ কিছু-একটা হতে যাচ্ছে। মামা বললেন, 'খোঁজখবর না রাখায় এটা হচ্ছে। নানান ঝামেলায় থাকি।'

খোঁজখবর নেই তা ঠিক। মামার বাড়ির সঙ্গে এখন সম্পর্ক নেই বললেই হয়। মামারা অনেকদিন ধরে আসেন না। আগে ঘনঘন আসতেন এবং যতবার আসতেন

ততবারই জিদ করতেন আমাদের দিনাজপুরে নেবার জন্যে। বাবা ব্যবসাপাতির ঝামেলা তুলে এড়িয়ে যেতেন। মা স্পষ্ট বলতেন, 'তোমাদের বৌদের সঙ্গে আমার বনে না। বাবা-মা মারা গেলে বাপের বাড়ি থাকে না। সেখানে যাওয়াও যায় না।'

বাবা আবার বিয়ে করবেন কিনা এই প্রসঙ্গে বড় মামার এরকম কৌতূহলের কারণ কী আমি ধরতে পারি না। মামাদের সঙ্গে আমার বাবার তেমন আন্তরিকতা নেই। এইসব নিয়েও মার সঙ্গে তাঁর ঝগড়া হত। মা বলতেন, 'আমার ভাইদের তুমি সহ্য করতে পার না, এর কারণ কী আমাকে বলো তো?'

'সহ্য করতে না পারার কী আছে?'

'কথা বল না, চুপচাপ থাক।'

'একেক জনের একেক রকম স্বভাব। আমার স্বভাবই হচ্ছে কথা কম বলা।'

'দোতলার নজমুল হুদা সাহেবের সঙ্গে তো খুব বকবক কর।'

'আমি বকবক করি না। উনি করেন আমি শুনি।'

'আমার ভাইদের সঙ্গে তো তাও কর না।'

'ওনার বকবকানি শোনা যায়। তোমার ভাইদেরটা শোনা যায় না।'

'ও — তাই বুঝি?'

বাবা চুপ। মা কাটা-কাটা গলায় বললেন, 'বেশ তো, আমি ওদের বলব যেন আর না আসে।'

মামাদের আসা বন্ধ হয়নি। আমার ধারণা, বাবার কাছ থেকে তাঁরা টাকা পয়সা নিতেন। আমার সব মামারাই ব্যবসা করতেন। টাকার দরকার তাদের লেগেই থাকত। এটা অবশ্যি আমাদের অনুমান। কারণ মামারা হঠাৎ এসে উপস্থিত হলেই মা গম্ভীর মুখে বলতেন, 'দরকার ছাড়া তো তোমাদের আসা হয় না, আবার দরকার হয়েছে বুঝি?' মামারা অপ্রস্তুত ভঙ্গিতে হাসতেন।

এবারো যখন এলেন সম্ভবত টাকার জন্যেই এলেন। বাবার ব্যবসাপাতির অবস্থা সম্পর্কে খুব ব্যস্ত হয়ে খোঁজখবর শুরু করলেন। আমার ঘরে ঢুকে গম্ভীর মুখে জিজ্ঞেস করলেন, 'দুলাভাইয়ের ব্যবসা কেমন চলছে রে?'

'ভালই বোধহয়। আমি তো এইসব ঠিক জানি না।'

'না জানলে হবে কেন? খোঁজখবর রাখতে হয়। দুলাভাইয়ের ছেলে নেই। তোদেরই তো খোঁজ করতে হবে। ঠিক না?'

আমি চুপ করে থাকি। বড় মামা সিগারেট ধরান একটা। নিচু গলায় বললেন, 'মনে হয় দুলাভাইয়ের ব্যবসা ভালই হচ্ছে। তোদের গান-বাজনা শেখাচ্ছেন, এসব তো দারুণ খরচান্ত ব্যাপার। হাতি পোষার মতো, লাভ হয় না কিছু।'

'লাভ হবে না কেন?'

'আরে দূর, দুই-একদিন সারেগামা করলেই যদি গান হত তাহলে কি আর কথা ছিল নাকি?'

আমি কোনো উত্তর দিলাম না। বড় মামা হঠাৎ করে বললেন, 'তোদের এখন শাড়ি পরা উচিত, বুঝলি? তোর আর নীলুর। বড় হয়ে গেছিস।'

কথাটা এমন অপ্রাসঙ্গিকভাবে বলা যে আমি হকচকিয়ে গেলাম। বড় হয়ে যাচ্ছি। বড় হওয়াটা খুব-একটা কি বাজে ব্যাপার?

'রাস্তাঘাটে একা একা চলাফেরা করবি না। ঐদিন দেখলাম সন্ধ্যার পর নীলু বাড়ি আসল।'

'বন্ধুর বাড়ি গিয়েছিল। জন্মদিন।'

'জন্মদিন-ফন্মদিন যাই হোক একা একা যেন না যায়। সুন্দরী মেয়েদের অনেক রকম যন্ত্রণা।'

'আমরা সুন্দরী বুঝি?'

'হুঁ, ইয়ে, সুন্দরী তো বটেই। আয়না দিয়ে নিজেদের দেখিস না?'

আমি হঠাৎ বলে বসলাম, 'কে বেশি সুন্দর মামা? আমি না নীলু?'

মামা জবাব দিলেন না। তাঁকে খুব চিন্তিত মনে হতে লাগল।

৬

ক্লাস নাইনের হাফ ইয়ার্লি পরীক্ষাতে নীলু অঙ্ক এবং ইংরেজিতে পাস করতে পারল না। অঙ্ক পেল তেইশ আর ইংরেজিতে একত্রিশ। তাকে খুব বিচলিত মনে হল না। হাসিমুখে বলল, 'দূর — আমি আর পড়াশুনা করব না।'

'করবি না তো কী করবি?'

'বিয়ে করব।'

'বিয়ে করবি মানে! কাকে বিয়ে করবি?'

'বিয়ে করার লোকের অভাব আছে নাকি? আমি 'হ্যাঁ' বললে এক্ষুনি দু'-তিনটা ছেলে চলে আসবে।'

'তাই নাকি?'

'হুঁ, তুই কী ভাবিস আমাকে?'

আমি প্রসঙ্গ পাল্টে বললাম, 'বাবা পরীক্ষার রেজাল্ট দেখে রাগ করবেন।'

'রাগ করবার কী আছে? সবাই একরকম হয়? কেউ ভাল করে, কেউ করে না।'

বাবা রাগ করলেন না। প্রগ্রেস রিপোর্টটা দেখলেন অবাক হয়ে।

'এরকম হয়েছে কেন নীলু?'

'পড়াশুনা করতে আমার ভাল লাগে না বাবা।'

'আগে তো লাগত।

'আগেও লাগত না। জোর করে পড়তাম।'

'ভাল না লাগলেও অনেক কিছু করতে হয় নীলু। তোমাদের জন্যে একজন টীচার রেখে দিলে কেমন হয়?'

নীলু কথা বলে না। বাবা বললেন, 'তোমার কী মনে হয় বিলু মা?'

'ভালই হবে।'

নীলু হালকা স্বরে বলল, 'এখন থেকে আমি একা একটা ঘরে থাকতে চাই বাবা। পশ্চিমের ঐ ঘরটা পরিষ্কার করে দিলেই হবে। আমি রমজান ভাইকে বলব।'

'একা থাকার দরকার কী? তোমার তো আবার ভূতের ভয়।'

'এখন আমার ভূতের ভয় নেই বাবা।'

'আমার মনে হয় না এটা ভাল হবে।'

'ভালই হবে বাবা।'

'ঠিক আছে। সেতারা কার সঙ্গে থাকবে?'

'তোমার সঙ্গে কিংবা বিলুর সঙ্গে।'

নীলু উঠে চলে গেল। বাবা গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তোর সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি হয়েছে?'

'জ্বি না।'

'স্কুলে আপারা বকাঝকা করেছে বোধহয়। জানিস কিছু?'

'জ্বি না।'

নীলু সারা দুপুর জিনিসপত্র সরিয়ে পশ্চিমের ঘরটা গোছাল। আমি কয়েকবার বললাম, 'এই — রাত্রিবেলা ভয় পাবি।' নীলু কোনো উত্তর দিল না। বিকেলের মধ্যে দেখলাম ঘর তৈরি হয়ে গেছে। একটা খাট। পড়ার টেবিল। আলনা। মায়ের ড্রেসিং টেবিল দিয়ে চমৎকার সাজিয়েছে। আশ্চর্যের ব্যাপার হচ্ছে, এক ফাঁকে আমাদের ঘর থেকে মায়ের ছবিটাও নিয়ে গেছে।

সেতারা পড়েছে খুব মুশকিলে। সে রাতে কার সঙ্গে ঘুমোবে বুঝতে পারছে না। আমাকে সে ঠিক পছন্দ করে না। বাবার সঙ্গেও থাকতে চায় না। কিন্তু নীলু বলে দিয়েছে সে একা একা ঘুমোবে। আমি সেতারাকে বললাম, 'ওর যা ভূতের ভয়, দেখবি রাত আটটা বাজলেই এই ঘরে চলে আসবে কিংবা তোকে নিয়ে যাবে।'

সেতারা খুব-একটা ভরসা পাচ্ছে না। সে মুখ কালো করে দুপুর থেকেই আমার পেছনে ঘুরছে।

ছুটির দিন বিকালে সাধারণত নজমুল চাচা আমাদের সঙ্গে এসে চা খান। আজ তিনি খবর পাঠালেন তাঁর ঘরে গিয়ে যেন আজকের চা'টা খাওয়া হয়। তিনি মুক্তাগাছার মণ্ডা আনিয়েছেন। নীলু বলল, 'দূর — আমি যাব না।'

'যাবি না কেন?'

'আমার মাথা ধরেছে।'

'দুটো এসপিরিন খা।'

'বললাম তো ভাল লাগছে না।'

নীলু তার ঘরে ঢুকে দরজা বন্ধ করে দিল।

নজমুল চাচার শরীর ভাল ছিল না। চাদর মুড়ি দিয়ে বসে ছিলেন। নজমুল চাচা সাধারণত চা খেতে খেতে মজার মজার গল্পগুজব করেন। আজ সেসব কিছুই হল না। নজমুল চাচা বিরসমুখে বললেন, 'তোর বাবার একটা বিয়ের কথা হচ্ছে। মেয়েটির হাসবেন্ড মারা গেছে একাত্তুরের যুদ্ধে। একটি ছেলে আছে। ন'বছর বয়স। ছেলেটা তার নানার কাছে থাকে।'

আমি কিছু বললাম না। নজমুল চাচা বললেন, 'মেয়েটা খুব ভাল। আমি চিনি। প্রাইমারি স্কুলের টীচার। একদিন নিয়ে আসব এখানে। তোরা কথাবার্তা বলিস।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'সৎ মায়ের অত্যাচার-টত্যাচার সম্পর্কে যা শোনা যায় সেসব ঠিক না। তা ছাড়া তোরা তো যথেষ্ট বড় হয়েছিস। এত বড় বড় মেয়েরা তো সাধারণত বন্ধুর মতো হয়। ঠিক না?'

'জানি না, হয়তো হয়।'

'তোর বাবার অবস্থাটা দেখতে হবে না ? রাত-বিরাতে বাড়ি ফেরার বাজে অভ্যাস হয়ে যাচ্ছে।'

আমি চুপচাপ বসে রইলাম।

'নীলু আসেনি যে?'

'ওর নাকি মাথা ধরেছে।'

'ও নাকি পরীক্ষা খুব খারাপ করেছে?'

'জ্বি।'

'সংসারে বিশৃঙ্খলা আসার জন্যে এটা হয়েছে। বুঝতে পারছিস তো?'

চাচা আরো কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, রমজান ভাই এসে বলল, 'ইউনিভার্সিটির একজন মাস্টার নাকি নিচে বসে আছে।'

চাচা অবাক হয়ে বললেন, 'কিসের মাস্টার? মাস্টার এখানে কী জন্যে? বিলু, তুই উপরে আমার কাছে পাঠিয়ে দে তো!'

বসার ঘরে গম্ভীর চেহারার একজন ভদ্রলোক বসে আছেন। বয়স খুব বেশি নয় ; কিন্তু অন্য রকমের একটি ভারিক্কি ভাব আছে। ভদ্রলোক আমাকে দেখেই বললেন, 'একটু দেরি করে ফেললাম, না?'

'আমি কিছুই বুঝতে পারলাম না।'

'আমি আগেই আসতাম। ভাবলাম জন্মদিনে খালিহাতে আসা ঠিক না। কিন্তু তোমাদের এখানে তো কিছু পাওয়া যায় না। আমি ঘণ্টাখানিক ঘোরাঘুরি করেছি। কবিতার বই পাওয়া যায়। কবিতা তো তুমি পড় না, নাকি পড়?'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'আপনি বোধহয় নীলুর কাছে এসেছেন। আমি ওর ছোট বোন বিলু। আমরা যমজ বোন।' ভদ্রলোক দীর্ঘ সময় স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলেন।

'নীলু আমাকে বলেনি তার যমজ বোন আছে। লোকজন কি সব চলে গেছে নাকি?'

'কিসের লোকজন?'

'আজ নীলুর জন্মদিন না?'

'না তো!'

'ও আমাকে বলেছিল আসতে। সম্ভবত ঠাট্টা। আমি বুঝতে পারিনি। আমি ঠাট্টা বুঝতে পারি না।'

ভদ্রলোক চোখ থেকে চশমা খুলে কাঁচ মুছতে লাগলেন। আমি বললাম, 'আপনি বসুন, আমি নীলুকে ডেকে নিয়ে আসি।'

'তোমাদের চেহারায় অদ্ভুত মিল। যমজ বোনদের মধ্যেও কিছু ডিফারেন্স থাকে। একজন মোটা হয় অন্যজন রোগা, কিন্তু . . .'

ভদ্রলোক চুপ করে গেলেন।

'আপনি বসুন, আমি এক্ষুনি ডেকে আনছি।'

নীলুকে ভদ্রলোকের কথা বলতেই সে ফ্যাকাসে হয়ে গেল।

'এইসব কী রে নীলু? ভদ্রলোক কে?'

'মুন্নিকে তো চিনিস? মুন্নির দূর সম্পর্কের ভাই।'

'তাঁকে আসতে বলেছিলি?'

'হুঁ।'

'কেন?'

'এমনি বলেছি।'

'আয় তা হলে। কী যে কাণ্ড!'

'আমি যেতে পারব না। আমার মাথা ধরেছে!'

নীলুর মাথা ধরেছে এবং গায়ে বেশ জ্বর শুনে ভদ্রলোক অল্প হাসলেন।

'আচ্ছা ঠিক আছে, আমি তা হলে যাই। ওর জন্যে দুটো বই এনেছিলাম — দিয়ে দিও।'

'আপনি বসুন, চা খেয়ে যান।'

'তোমার বাবা আছেন?'

'জ্বি না। উনি রাত করে ফেরেন।'

'তোমার বাবা যখন থাকবেন তখন একদিন আসব।'

ভদ্রলোক উঠে দাঁড়ালেন। হাসিমুখে বললেন, 'আমি আসব এটা বোধহয় নীলু ভাবেনি। এসে পড়েছি দেখে হকচকিয়ে গেছে।'

'আপনি বসুন-না, চা খেয়ে যান। উপরে নজমুল হুদা চাচা আছেন, তাঁর কাছেও বসতে প্যারেন।'

'না না, ঠিক আছে।'

আমি ভদ্রলোককে গেট পর্যন্ত এগিয়ে দিলাম। ভদ্রলোক শান্ত স্বরে বললেন, 'বেশ একটা অস্বস্তিকর অবস্থা হয়ে গেল, তাই না? আমার প্রবলেম হচ্ছে আমি ঠাট্টা-তামাশা ঠিক ধরতে পারি না। মনে হয় আমার বুদ্ধিশুদ্ধি নিচুস্তরের।'

বলেই ভদ্রলোক উঁচু গলায় হেসে উঠলেন। একজন ভারিক্কি ধরনের গম্ভীর চেহারার ভদ্রলোক এমন ছেলেমানুষের মতো হেসে উঠবেন আমি কল্পনাও করিনি।

৭

নীলু বলল, সে রাতে খাবে না।

'কেন খাবি না রে?'

'বললাম না — জ্বর।'

রমজান ভাই কাউকে না খাইয়ে ছাড়ে না। সে ক্রমাগত ঘ্যানঘ্যান করতে লাগল, 'রাইতে ভাত না খাইলে এক চড়ুইয়ের রক্ত পানি হয়।'

নীলু শব্দ করল না। তার ঘরের দরজাও খুলল না। সেতারার মনে ক্ষীণ আশা ছিল হয়তো শেষ পর্যন্ত নীলু তাকে ডেকে নেবে। সেসব কিছুই হল না। রাত ন'টা বাজতেই নীলু তার ঘরের বাতি নিভিয়ে দিল।

খুব বৃষ্টি হল সে রাতে — ঝমঝম করে বৃষ্টি। আকবরের মা বলল, 'আশ্বিন মাসে বিষ্টি, লক্ষণ খুব বালা।'

আমি অনেক রাত পর্যন্ত বাবার জন্যে অপেক্ষা করতে লাগলাম। বাবাকে কি সব খুলে বলা উচিত? বাবা খুব দেরি করতে লাগলেন। ঝড়বৃষ্টিতে এদিকে সব ভাসিয়ে নিচ্ছে।

বাবা ফিরলেন গভীর রাতে। আমি ঘুমিয়ে পড়েছিলাম। রমজান ভাই আমাকে ডেকে

{ }লে ফিসফিস করে বলল, 'ছোট আফা, লক্ষণ বেশি বালা না!'

'কেন, কী হয়েছে?'

'মদ খাইয়া আইছে।'

সমস্ত রাত আমার ঘুম হল না।

সেতারা এক কাণ্ড করেছে। রাতারাতি বিখ্যাত হয়ে গেছে। দুটি পত্রিকার (দৈনিক বাংলা, অবজার্ভার) প্রথম পাতায় তার ছবি ছাপা হয়েছে। প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমানের হাত থেকে শিশু সংগীত সম্মেলনের গ শাখায় স্বর্ণপদক নিচ্ছে।

অথচ বাবা সেতারাকে ঢাকায় যেতেই দিতে চাননি। গানের স্যারের কত ধরাধরি কত সুপারিশ! বাবার এক কথা, 'না, এইসবের দরকার নেই।'

শেষ পর্যন্ত নজমুল চাচা যখন সঙ্গে যেতে রাজি হলেন তখনই শুধু গম্ভীর মুখে বাবা রাজি হলেন।

ঢাকায় গিয়ে সে যে এই কাণ্ড করেছে তাও আমরা জানি না। রমজান ভাই পত্রিকা পড়ে প্রথম জানল এবং এমন চেঁচামেচি শুরু করল —।

সেতারা যে ভেতরে ভেতরে এমন ওস্তাদ হয়ে উঠেছে তা আমরা বুঝতেই পারি নি। সকালবেলা ঘুম ভেঙেই অবশ্যি শুনতাম —

'কোয়েলিয়া বলেরে মাই
অঙ্গনা মোরে বারে বারে
পিয়া পরদেশ গাওন কিনু
সদারঙ্গ পিয়ারাবা। তোমাবিনা নয়নানা দরশন বারে বারে।'

একই জিনিস সকালে একবার বিকেলে একবার। মাথা ধরে যাওয়ার মতো অবস্থা বাবা পর্যন্ত গানের স্যারকে একদিন বললেন, 'ছয় সাত মাস ধরে একই জিনিস গাচ্ছে শুনতে খুবই বিরক্ত লাগে।'

গানের স্যার একগাল হেসে বললেন, 'সময় হলে দেখবেন। হা-হা-হা। সময় হোক-না!'

ফিরে আসবার পর সেতারার একটা সংবর্ধনাও হল। আমি সেতারাকে সঙ্গে করে নিয়ে গেলাম। বাবা কোথাও যানটান না। নীলুও যাবে না।

সংবর্ধনা অনুষ্ঠানে ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে দেখা হয়ে গেল। তিনি হাসিমুখে এগিয়ে এলেন, 'আরে নীলু, এই মেয়ে তোমার বোন? তুমি তো বলনি তোমার এমন গুণী বোন আছে। আসো তুমি, তোমার সঙ্গে কথা আছে।'

একবার ভাবলাম বলি, আমি বিলু। কিন্তু কিছুই বললাম না।

'আমি দিন দশেকের মধ্যে চলে যাব। ইউনিভার্সিটি খুলে যাচ্ছে।'

'ও।'

'পরশুদিন আসতে বলেছিলাম, আসনি তো?'

আমি অস্বস্তি বোধ করতে লাগলাম।

'আমি অনেকক্ষণ অপেক্ষা করেছিলাম। একবার ভাবলাম যাই তোমাদের বাসায়।'

'আমি বিলু। নীলু আসেনি।'

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

'এত পরে বলছ কেন? প্রথমে বললেই হত।'

ভদ্রলোক রাগী চোখে তাকালেন আমার দিকে। আমি এগিয়ে গেলাম সামনের দিকে। একবার পেছন ফিরে দেখলাম তিনি কেমন যেন খড়্গ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছেন আমার দিকে। আমার কেন জানি খুব কষ্ট হতে লাগল।

আমাকে কেউ তেমন পছন্দ করে না। কেন করে না আমি জানি না। নীলু অন্য ঘরে চলে যাবার পর সেতারাও চলে গিয়েছে তার সঙ্গে। আকবরের মা আগে আমার ঘরের সামনে পাটি পেতে ঘুমাত, এখন ঘুমোচ্ছে ওদের ঘরের সামনে। নজমুল চাচা সব ঈদে আমাদের উপহার দেন। আমি লক্ষ করেছি, নীলুর উপহারটা হয় অনেক সুন্দর, অনেক দামি।

ক্লাসের মেয়েরাও আমাকে পছন্দ করে না। টগরের বোনের বিয়েতে টগর ক্লাসের পাঁচজন মেয়ে ছাড়া সবাইকে দাওয়াত করল। আমি ঐ পাঁচজন মেয়ের মধ্যে একজন। সবাই এরকম করে কেন আমার সঙ্গে?

নীলু ইদানীং আমার সঙ্গে কথা বলা ছেড়েই দিয়েছে। নিজের থেকে কিছু জিজ্ঞেস করলে তবেই জবাব দেয়। সেদিন দেখলাম খুব সাজগোজ করছে। আমি বললাম, 'কোথায় যাচ্ছিস রে?'

'যাচ্ছি এক জায়গায়।'

'কোথায়?

নীলু চুপ করে রইল।

'ঐ ভদ্রলোকের কাছে যাচ্ছিস বুঝি?'

'গেলে কী হয়?'

'প্রায়ই যাস নাকি?'

'মাঝে মাঝে যাই।'

'এরকম যাওয়া ঠিক না। লোকজন খারাপ বলবে।'

'খারাপ বললে বলুক-না! আমি কি পায়ে ধরে সাধছি —আমাকে খারাপ না বলার জন্যে?'

আমি কিছুক্ষণ চুপ থেকে বললাম, 'ঐ ভদ্রলোকের নাম কী?'

'রকিব ভাই, অঙ্ক পড়ায়। খুব শিগগির আমেরিকা চলে যাবে।'

'উনিই বলেছেন বুঝি?'

'মুন্নি বলেছে। উনি মুন্নির খালাতো ভাই হন।'

'কোন মুন্নি? কালো মুন্নি?'

'হুঁ।'

নীলু কপালে একটা টিপ পরে অনেকক্ষণ আয়নার দিকে তাকিয়ে আবার টিপটি তুলে ফেলল। হালকা গলায় বলল, 'মুন্নির ধারণা রকিব ভাই ওকে বিয়ে করবে।'

'করবে নাকি?'

'কী জানি, করতেও পারে। আমার কিছু যায় আসে না। করতে চাইলে করবে।'

'যায় আসে না, তা হলে যাস কেন?'

নীলু থেমে থেমে বলল, 'আমি ওদের বাড়ি গেলেই মুন্নি রাগ করে। দারুণ রাগ করে। কিন্তু কিছু বলতে পারে না। আমার খুব মজা লাগে। সেইজন্যে যাই।'

'ছি, নীলু, এইসব কী?'

'শুধু মুন্নি না, ওর মাও রাগ করেন। সেদিন কী বলছিলেন শুনবি?'

'কী বলছিলেন?'

'বলছিলেন, মুন্নির সঙ্গে রকিব ভাইয়ের বিয়ের কথা সব পাকাপাকি হয়ে আছে, শ্রাবণ মাসে বিয়ে। ডাহা মিথ্যা। কোনো কথাই হয়নি।'

'তুই জানলি কী করে কোনো কথা হয়নি?'

'আমি জিজ্ঞেস করলাম।'

'কাকে জিজ্ঞেস করলি?'

'রকিব ভাইকে। আবার কাকে?'

'খুব খারাপ হচ্ছে নীলু।'

'খারাপ হলে আমার হচ্ছে, তোর তো হচ্ছে না। তুই আমার সঙ্গে বকবক করিস না। যা ভাগ।'

নীলু আজকাল স্কুলেও নিয়মিত যাচ্ছে না। সকালবেলা স্কুলে যাবার জন্যে তৈরি-টৈরি হয়ে হঠাৎ বলবে, 'আজকে আর যাব না। পেট ব্যথা করছে।'

সেদিন সেলিনা আপা (আমাদের হেড মিসট্রেস) আমাকে তার ঘরে ডেকে নিয়ে গেলেন। রাগী গলায় বললেন, 'তুমি কি গত শুক্রবারে কালোমত রোগা একটা ছেলের সঙ্গে হেসে হেসে কথা বলছিলে? বিউটি লন্ড্রির সামনে?'

'কই, না তো আপা!'

'আমিও তাই ভাবছিলাম। ঐটা নীলু। আজেবাজে ছেলের সঙ্গে আজকাল খুব মিশছে মনে হয়। তোমার বাবাকে বলবে। ঐ সব লোফার টাইপের ছেলে। পানের দোকানের সামনে দাঁড়িয়ে সিগারেট খায়, মেয়ে দেখলে শিস দেয়। বলবে তুমি তোমার বাবাকে।'

'জ্বি বলব।'

'ঠিক আছে, তোমার বলার দরকার নেই। তাঁকে বলবে আমার সঙ্গে দেখা করতে।'

'জ্বি আচ্ছা।'

'তা ছাড়া ও তো রেগুলার ক্লাসেও আসে না। বাড়িতে শাসন না থাকলে যা হয়।'

নীলু এসব শুনে গা দুলিয়ে হাসতে লাগল, 'দূর — ঐ ছেলের সঙ্গে আমি ঘসাঘসি করব কেন? আমাকে জিজ্ঞেস করল ক'টা বাজে। আমি বললাম। তারপর আমি বললাম — আপনার হাতে তো ঘড়ি আছে, আমাকে জিজ্ঞেস করছেন কেন? সে ব্যাটা একদম ঘাবড়ে গেল। আমতা-আমতা করে বলল — আমার ঘড়ি নষ্ট। আমি বললাম — মেয়েদের সঙ্গে কথা বলতে খুব ভাল লাগে, না? ছেলেটার যে কী অবস্থা! দূর থেকে অন্য বন্ধুগুলি তাকে দেখছে। হি-হি-হি। ঐ পাজিগুলি আগে আমাকে দেখলেই শিস দিত। এখন আর দেয় না।'

'আর কথা হয়নি ঐ ছেলের সাথে?'

'আর কথা হবে কেন?'

'সেলিনা আপা বাবার সঙ্গে কথা বলবেন।'

'বলুক।'

'বাবা খুব রাগ করবেন।'

'করলে করবে।'

৮

বাবা সত্যি সত্যি রাগ করলেন। বেশ রাগ। চিৎকার চেঁচামেচি। শুধু তাই না, এক পর্যায়ে প্রচণ্ড একটা চড় কষিয়ে দিলেন। নজমুল চাচা ছুটে এলেন, 'ছি ছি এসব কী কাণ্ড! মেয়ে বড় হয়েছে না?'

বাবা ঝাঁজাল স্বরে বললেন, 'ওর স্কুল এখন বন্ধ। তুমি একটা ছেলে দেখো তো, ওর বিয়ে দিয়ে দেব।'

'আচ্ছা, সেটা দেখা যাবে। বিয়ে দিতে চাইলে বিয়ে দেবে। বিলু মা, তুমি আমাদের দু'কাপ চা দাও তো! লেবু দিয়ে।'

নীলু যেন কিছুই হয়নি এমন ভঙ্গিতে বলল, 'আমাকেও এক কাপ চা দিস তো!'

পরদিন নীলু স্কুলে গেল না। সন্ধ্যাবেলা বাবার সামনেই তার সমস্ত বই-খাতা বারান্দায় জমা করতে লাগল। বাবা ইজিচেয়ারে বসে অবাক হয়ে দেখতে লাগল।

'কী করছিস নীলু?'

'বইপত্রগুলি সব ফেলে দিচ্ছি বাবা। পড়াশোনা তো আর করছি না। বই দিয়ে কী হবে?'

'পড়াশোনা করবি না আর?'

'না। তুমি নিষেধ করলে। তা ছাড়া আমারও ভাল লাগে না।'

'কী করবি ঠিক করেছিস?'

'এখনো কিছু ঠিক করিনি।'

বাবা আর কিছু বললেন না। রাতে ভাত খাবার সময় হঠাৎ অপ্রাসঙ্গিকভাবে বললেন, 'রাগের মাথায় অনেকে অনেক কিছু বলে, সেসব মনের মধ্যে পুষে রাখা ঠিক না।'

নীলু মুখ না তুলেই বলল, 'আমি মনের মধ্যে কিছু পুষে রাখিনি।'

আর কোনো কথাবার্তা হল না।

সে রাতে বাবা বাইরে গেলেন না। গম্ভীর হয়ে সেতারার পড়া দেখিয়ে দিতে বসলেন। সেতারা ক্লাস সিক্সে উঠেছে। নতুন ক্লাসে উঠেছে বলেই পড়াশোনায় খুব আগ্রহ। সে হাসি- মুখে তার বইপত্র দেখাতে লাগল। বাবা একসময় আমার পড়াশোনারও খোঁজ নিলেন, 'পড়াশোনা ঠিকমত হচ্ছে তো?'

'জ্বি, হচ্ছে।'

'প্রি-টেস্ট কবে?'

'এখনো দেরি আছে।'

'কোন কলেজে পড়বি কিছু ভেবেছিস? ঢাকায় যেতে চাস নাকি?'

'নাহ্‌।'

'ঢাকা না যাওয়াই ভাল, যা গোলমাল! এই স্ট্রাইক ওই স্ট্রাইক।'

'তা ঠিক।'

নীলু আমাদের কাছেই কী-একটা গল্পের বই নিয়ে উবু হয়ে আছে, যেন কোনো কিছুই তার কানে যাচ্ছে না।

'নীলু, এত মন দিয়ে কী পড়ছিস?'

'ভূতের গল্প।'

'নাম কী?'

'ডাকবাংলা রহস্য।'

'খুব ভয়ের নাকি?'

'খুব না। কিছু ভয়ের।'

বাবা হঠাৎ বললেন, 'তোরা সবাই মিলে মামার বাড়ি থেকে ঘুরে আয়-না। একটা চেঞ্জ হবে। সেতারার তো বোধহয় মনেই নেই।'

'মনে আছে বাবা, পুকুরপাড়ে দুটো তালগাছ আছে । আর পুকুরের ঘাটে বসে থাকলে একরকম মাছ আসে। চোখগুলো বড় বড়। ঠিক না নীলু আপা?'

'হুঁ, চ্যালা মাছ।'

বাবা আবার বললেন, 'কি রে, যাবি নাকি তোরা? যাস যদি তোর মামাকে লিখি । এসে নিয়ে যাবে।'

'তুমি যাবে না?'

'নাহ্। আমার ব্যবসা-ট্যাবসা খুব খারাপ। তোরা তো জানিস না। অবশ্যি আমি নিজেই বলি না কিছু। প্রেসটা আমি খুব সম্ভব বিক্রি করে দেব। বয়স হয়ে গেছে, এইসব ঝামেলা এখন আর ভাল লাগে না।'

নীলু বাবার কথা শুনল, কিন্তু কিছু বলল না।

'যাবি মামার বাড়ি?'

'যাওয়া যায়।'

'আচ্ছা ঠিক আছে, লিখে দেব তোর মামাকে। পৌষ মাসের দিকে গেলে ধান কাটা দেখবি।'

সে রাতে ঘুমোতে গেলাম দশটার দিকে। সেতারা তার বালিশ নিয়ে এসে হাজির। 'আপা, আজ তোমার সঙ্গে ঘুমাব।'

'আয়। হঠাৎ আমার সঙ্গে যে!'

'নীলু আপা বলেছে আজ সে একা একা ঘুমোতে চায়।'

বাতি নেভাতে সেতারা ফিসফিস করে বলল, 'একটা কথা জিজ্ঞেস করি আপা, রাগ করবে না তো?'

'না, রাগ করব কেন?'

'আগে গা ছুঁয়ে বলো রাগ করবে না।'

'রাগ করব না, বল।'

সেতারা বেশ খানিকক্ষণ ইতস্তত করে বলল, 'মেয়েদের যখন শরীর খারাপ থাকে তখন কোনো ছেলেকে চুমু খেলে নাকি পেটে বাচ্চা হয়?'

'বলেছে কে এসব?'

'বলো না হয় কি না?'

'না, হয় না। এইসব জিনিস নিয়ে না ভাবাই ভাল।'

'তা হলে বাচ্চা কীভাবে হয়?'

'জানি না কীভাবে হয়, ঘুমা তো।'

সেতারা ঘুমিয়ে পড়ল প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। সেতারাও অনেকটা আমার মতো, এ

বাড়িতে তার কথা বলার কেউ নেই। স্কুলে তেমন বন্ধুবান্ধব নেই। সেদিন দেখলাম টিফিনের সময় ওদের ক্লাসের সব মেয়ে মিলে 'চুলটানা বিবিয়ানা সাহেববাবুর বৈঠকখানা' খেলা খেলছে। সেতারা দূরে দাঁড়িয়ে তৃষিত নয়নে দেখছে।

আমি সেতারার গায়ে হাত রাখতেই সেতারা বলল, 'মাকে কাল রাতে আমি স্বপ্নে দেখেছি আপা। খুব লম্বা লম্বা চুল।'

আমি অবাক হয়ে বললাম, 'তুই ঘুমাসনি?'

'উঁহু।'

'আয় দুজনে মিলে এক কাজ করি, নীলুকে ভয় দেখিয়ে আসি।'

সেতারা উত্তেজনায় উঠে বসল। 'কীভাবে ভয় দেখাবে? জানালার কাছে গিয়ে "হুঁম" করবে?'

'তা করা যায়। যাবি?'

'চলো।'

আমরা দরজা খুলে পা টিপে টিপে বাইরে এসে দেখি বাবা ইজিচেয়ারে শুয়ে আছেন। তাঁর পাশে মোড়ায় গুটিশুটি মেরে নীলু বসে আছে। বাবা নীলুর মাথায় হাত বুলাচ্ছেন। নীলু সম্ভবত কাঁদছে। বাবা আমাদের দেখে হালকা গলায় বললেন, 'কী রে সেতারা — বাথরুমে যাবি নাকি?'

'না বাবা, আমরা নীলু আপাকে ভয় দেখাবার জন্যে এসেছি।'

বাবা হেসে উঠলেন। দীর্ঘদিন পর বাবা এমন উঁচু গলায় হাসলেন।

নীলু চোখ মুছে বলল, 'আমাকে ভয় দেখানো এত সস্তা না!'

৯

আমাদের বাড়িটির একটি নাম আছে — 'উত্তর দিঘি'। বাড়ির কত সুন্দর সুন্দর নাম থাকে, কিন্তু এ বাড়িটি দেখতে যেমন অদ্ভুত, নামটিও তেমনি। মায়ের খুব শখ ছিল শ্বেতপাথরের একটা নতুন নেম-প্লেট লাগাবেন, 'মাধবী ভিলা' লেখা থাকবে সেখানে।

বাড়িটি কিনেছিলেন আমার দাদা। তিনি ধুরন্ধর প্রকৃতির লোক ছিলেন। দাঙ্গার সময় যখন ময়মনসিংহ শহরের বেশির ভাগ ধনী হিন্দু জলের দামে বাড়ি বিক্রি করে কোলকাতায় চলে গেল, আমার দাদা তখন 'উত্তর দিঘি' ও 'শ্রীকালী প্রেস' কিনে ফেললেন। টাকা যা দেয়ার কথা তার অর্ধেকও নাকি দেননি। এইসব আমার মায়ের কাছ থেকে শোনা। মা নাকি বিয়ের পর অনেকদিন দেখেছেন বাড়ির মালিক বাকি টাকার জন্যে এসে বসে আছে এবং দাদা নানান রকম টালবাহানা করছেন। তার কিছুদিন পর দাদা মারা যান। আমার ধারণা লোকটিকে টাকাপয়সা না দেয়ার জন্যেই নিদারুণ যন্ত্রণায় দাদার মৃত্যু হয়েছে। তাঁর পেটে ক্যানসার হয়েছিল।

আমাদের 'উত্তর দিঘি' বাড়িটি প্রকাণ্ড। দোতলা বাড়ি। তবে ছাদে ওঠার কোনো সিঁড়ি নেই। মার খুব শখ ছিল ছাদে ওঠার সিঁড়ি করবেন। জোছনা রাতে ছাদে হাঁটাহাঁটি করা যাবে। হাঁটাহাঁটি করার জায়গার অভাব এ বাড়িতে নেই। অনেকখানি জায়গা জুড়ে বাড়ি। কাঁঠাল পেয়ারা আম এবং তেঁতুলগাছ দিয়ে বাড়িটা ঘেরা। বাড়ির সামনে ফুলের গাছ আছে বেশ কয়েকটা এবং জায়গায় জায়গায় সিমেন্ট দিয়ে উঁচু বেদির মতো করে

বাধানো। সেখানে বসে খুব আরাম করে গল্পের বই পড়া যায়। আমার যখন কিছু ভাল লাগে না তখন আমি লাল বেদিগুলোর কোনো-একটিতে বসে থাকি। নীলুর মতে ওগুলো আমার গোসাঘর।

আজ আমার মন খুব ভাল ছিল। মন ভাল হওয়ার কোনো কারণ ঘটেনি। কিন্তু ভাল লাগছিল। তবু আমি গোসাঘরে এসে চুপচাপ বসে রইলাম। সেতারা দোতলার বারান্দায় বসে গলা সাধছিল। বেশ লাগছিল শুনতে । এমন সময় একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটল। নীলুর সেই রকিব ভাই হঠাৎ করেই যেন আমার সামনে এসে উপস্থিত হলেন। এখানে আসতে হলে গেট খুলে অনেকখানি হাঁটতে হয়। কখন গেট খুললেন এবং কখনই-বা এলেন!

'ভাল আছ?'

'আপনি ভাল আছেন?'

'আমি অনেকক্ষণ ধরে লক্ষ করছিলাম, তুমি পাথরের মূর্তির মতো বসে আছ। তোমার বাবা বাসায় আছেন?'

'জ্বি না। সন্ধ্যানাগাদ আসবেন।'

'আমি তাঁর সঙ্গে দেখা করব আজকে, কী বল?'

'ঠিক আছে।'

'আমি পরশুদিন সকালে ঢাকা চলে যাব। ভাবলাম যাবার আগে দেখা করে যাই। আর আসা হবে কি না জানি না।'

'আর আসবেন না বুঝি?'

ভদ্রলোক গম্ভীর হয়ে বললেন, 'তুমি কি আসতে বল?'

আমি চুপ করে রইলাম।

'কী, কথা বলছ না যে?'

'আমি কিন্তু বিলু, আপনি আমাকে নীলু ভাবছিলেন।'

ভদ্রলোক চশমা খুলে কাঁচ পরিষ্কার করতে লাগলেন।

'নীলু কি বাসায় আছে?'

'জ্বি আছে। আপনি ভেতরে এসে বসুন, আমি ডেকে দিচ্ছি।'

'না, ঠিক আছে, ডাকতে হবে না।'

'ডাকতে হবে না কেন? আপনি তো ওর সঙ্গেই কথা বলতে এসেছেন?'

ভদ্রলোক মাথা নাড়লেন।

'ঠিক তা না। আমি নদীর ধার দিয়ে অনেকখানি হাঁটি। আজও তাই করছিলাম। হঠাৎ তোমাকে দেখলাম। ভাবলাম নীলু।'

'ও।'

'নীলু অনেকদিন মুন্নিদের বাড়িতে যায় না। মনে হয় ওর সঙ্গে ঝগড়া হয়েছে। তুমি জান কিছু?'

'জ্বি না। ওর সঙ্গে আমার কথা বন্ধ।'

ভদ্রলোক অদ্ভুত দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। তারপর বললেন, 'তোমরা যে বাচ্চা মেয়ে এটাও মনে থাকে না।'

'আমি বুঝি বাচ্চা মেয়ে?'

'হুঁ। তোমরা আড়ি দাও এবং ভাব দাও। ঠিক না?'

'আমি দিই না, নীলু দিতে পারে। আসুন, ভেতরে এসে বসুন। নজমুল চাচা আছেন, দোতলায় তাঁর ঘরেও বসতে পারেন।'

'নজমুল চাচা কে?'

'আমাদের একজন ভাড়াটে। দোতলায় একটা ঘর নিয়ে থাকেন।'

'নীলু শোনো, আমি এখন আর ঘরে ঢুকব না।'

'আমি কিন্তু বিলু।'

'ও হ্যাঁ, বিলু। তুমি এক কাজ করো, আমি নীলুর জন্যে একটা গল্পের বই এনেছিলাম, "ঘনাদার গল্প", ওটা ওকে দিয়ে দিও।'

আমি অল্প হাসলাম। ভদ্রলোক তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালেন, 'হাসছ কেন?'

'আপনি একটু আগে বলেছিলেন নীলুর সঙ্গে দেখা করবার জন্যে আসেননি, এখন বলছেন বই নিয়ে এসেছেন — তাই হাসছি।'

ঠিক তখন দোতলার বারান্দা থেকে নজমুল চাচা ডাকলেন, 'এই — এই বিলু, উনি কে?'

নজমুল চাচার গলা ভয়-ধরানো, যেন হঠাৎ ভূত দেখেছেন। অনেকক্ষণ থেকেই বারান্দায় দাঁড়িয়ে ছিলেন হয়তো।

পরিচয় করিয়ে দেবার পর নজমুল চাচা অতিরিক্ত ব্যস্ত হয়ে পড়লেন।

'আরে, আপনি জমির আহমেদ সাহেবের ছেলে? আপনাকে চিনব না, বলেন কী! আপনার বাবা ছিলেন কালিনারায়ণ স্কলার।'

'আমি বাবার মতো হইনি অবশ্যি।'

'আরে, আপনিই কম কী। অঙ্কের প্রফেসর। কী সর্বনাশ!'

'প্রফেসর না। লেকচারার।'

'আমার কাছে লেকচারারও যা প্রফেসরও তা। কী আশ্চর্য কাণ্ড বলেন দেখি! নীলুর সঙ্গে আলাপ হল কীভাবে?'

'ও আমাকে একটা অঙ্ক জিজ্ঞেস করেছিল, আমি বলতে পারিনি।'

'বলেন কি! কী অঙ্ক?'

'ও জিজ্ঞেস করল — পাঁচের সঙ্গে দুই যোগ করলে কখন ছয় হয়?'

'কখন হয়?'

'যখন ভুল হয় তখন হয়। অঙ্কটা আসলে সহজ।'

নজমুল চাচা ঘর কাঁপিয়ে হেসে উঠলেন। আমাকে ধমক দিয়ে বললেন, 'যা, নীলুকে আসতে বল। বলবি প্রফেসর সাহেব এসেছেন। চা-টার ব্যবস্থা করতে হবে।'

আমি ঘর থেকে বেরোবার সময় শুনলাম ভদ্রলোক বলছেন, 'আপনি কি বুঝতে পারেন — কে বিলু কে নীলু?'

'পারি। নীলুটা খুব হাত নেড়ে কথা বলে।'

রকিব সাহেব দোতলায় বসে আছেন শুনে নীলু দারুণ অবাক হল।

'সে কী, আমি তো বলেছি এ বাড়িতে যেন কখনো না আসেন।'

'কী জন্যে বলেছিস?'

'দূর, ভাল্লাগে না।'

'ভাল্লাগে না কেন?'
'এমনভাবে কথা বলে যেন আমি বাচ্চা মেয়ে।'
'যাবি না তা হলে?'
'উঁহু।'
নীলু যদিও বলল উঁহু, কিন্তু আমি দেখলাম সে কামিজ বদলে শাড়ি পরছে।
'শাড়ি পরছিস কেন?'
'ইচ্ছা হয়েছে পরছি। তোকে জিজ্ঞেস করে কাপড় পরতে হবে?'
নীলু অনেক সময় নিয়ে মুখে পাউডার দিল এবং একসময় চিরুনি হাতে এসে বলল, 'চুল বেঁধে দিবি?'
আমি চুল বেঁধে দিয়ে বললাম, 'আজ আর তোকে কেউ বাচ্চা মেয়ে বলবে না।'
নীলু রাগী স্বরে বলল, 'তুই কি ভাবছিস আমি দোতলায় যাচ্ছি? মোটেই না, আমি বাগানে হাঁটতে যাচ্ছি। সেতারার গলা সাধা শেষ হলেই যাব।'
আমি দেখলাম নীলু সত্যি সত্যি সেতারাকে নিয়ে বাগানে বেড়াচ্ছে। অপূর্ব লাগছে তাকে। আমার মনে হল এমন রূপবতী মেয়ে আমি আর কখনো দেখিনি।

১০

বড় মামার চিঠি এসেছে।
সুদীর্ঘ চিঠি। যার বক্তব্য হচ্ছে — এ সময় গ্রামের বাড়িতে নীলু-বিলুদের বেড়াতে আসা ঠিক হবে না। কী কারণে ঠিক হবে না তা স্পষ্ট করে বলা নেই। শুধু লেখা — গায়ের লোকজন এদের দেখতে এসে নানান কথা বলবে, এটা ওদের ভাল লাগবে না। মনের উপর চাপ পড়বে — এইসব। আমার কাছে একটা ব্যাপার খুব অবাক লাগল। চিঠির শেষে পুনশ্চতে লেখা — যা হবার হইয়াছে, এখন দুলাভাই, আপনি যদি হৃদয়ের মহত্ত্ব দেখাইয়া সব ভুলিয়া যান তাহা হইলে বড়ই আনন্দের বিষয় হয়। ভুল মানুষমাত্রই করে। ইহাই মানব ধর্ম।
এর মানে কী? নতুন করে এইসব কথা তোলা হচ্ছে কেন?
নীলুকে জিজ্ঞেস করতেই সে হেসে বলল, 'বুঝতে পারিছিস না? মা এখন মামার বাড়িতে।'
'তার মানে?'
'মানে-টানে জানি না। মা এখন মামার ঘাড়ে চেপে বসে আছে। মামা ঘাড় থেকে নামাতে চাইছে।'
'বুঝলি কী করে?'
'এখানে না-বোঝার কিছু আছে নাকি?'
নীলু তরল গলায় হাসল।
'শেষ পর্যন্ত দেখবি বাবা বলবেন, ঠিক আছে চলে আসুক। আর মা তার ছেলে কোলে নিয়ে এ বাড়িতে উঠে আসবেন। খুব কান্নাকাটি হবে কিছুদিন। তারপর সব ঠিকঠাক। মাঝখান থেকে আমরা একটা ভাই পেয়ে যাব।'
'তোর কথার কোনো ঠিকঠিকানা নেই নীলু।'

'না থাকলে কী আর করা! তবে এরকম হলে মন্দ হয় না। কী বলিস? বাড়ির অবস্থা খুব খারাপ হয়ে যাচ্ছে। যাচ্ছে না?'

'হুঁ।'

'বাবা যে হারে মদ-টদ খাচ্ছে! একেবারে দেবদাসের মতো —'

নীলু হেসে উঠল।

'এর মধ্যে হাসির কী আছে?'

'কান্নারও কিছু নেই।'

নীলু গম্ভীর মুখে বই নিয়ে পড়তে বসল। ইদানীং তার পড়াশোনায় খুব মনোযোগ হয়েছে। এই নিয়ে কিছু বললে সে গম্ভীর হয়ে বলে, 'তোরা সব স্টার-ফার পেয়ে পাস করবি আর আমি বুঝি ফেল করব? সেটা হচ্ছে না।'

এখন আমাদের স্কুলটুল নেই। পরীক্ষার প্রস্তুতি চলছে জোরেসোরে। সপ্তাহে তিনদিন কোচিং ক্লাস হয়। সেখানে মেয়েরা সবাই ভান করে যে কিচ্ছু পড়াশোনা হচ্ছে না। কে কোন কলেজে পড়বে সে নিয়েও ক্ষীণ আলোচনা হয়। হলিক্রস কলেজ ভাল না ইডেন ভাল সব মেয়েরাই সেটা জানে।

এমন সিরিয়াস পড়াশোনার সময়টাতেও আমাদের ক্লাসের বুবিনার বিয়ে হয়ে গেল। সেলিনা আপা খুব রাগ করলেন — বাবা-মাদের কোনো কাণ্ডজ্ঞান নেই নাকি? সেলিনা আপা খুব কাটা-কাটা কথা বলে অপমান করলেন বুবিনার বাবাকে। ঝাঁজাল গলায় বললেন, 'আপনাদের মত শিক্ষিত মূর্খের জন্যে দেশের এমন খারাপ অবস্থা।'

বুবিনা খুবই কান্নাকাটি করতে লাগল। গায়ে-হলুদের দিন দেখি কেঁদে মুখটুখ ফুলিয়ে ফেলেছে। বুবিনার এক মোটাসোটা খালা পানভর্তি মুখ নিয়ে বলে বেড়াচ্ছেন, 'ম্যাট্রিক ক্লাসটা হচ্ছে মেয়েদের বিয়ের বয়স। এরপর আর রসকষ থাকে না।' নীলুটা ফস করে বলে বসল, 'কেন, তখন রস কী হয়?'

বুবিনার খালা চোখ বড় বড় করে বললেন, 'এই ফাজিল মেয়েটা কে?'

নীলু হাসিমুখে বলল, 'ফাজিল বলছেন কেন?'

খুব হাসাহাসি শুরু হয়ে গেল চারদিকে। বুবিনার খালা রেগেমেগে অস্থির। কয়েকবার বললেন, 'আজকালকার মেয়েগুলি এমন কেন?'

অনেকদিন পর বুবিনার গায়ে-হলুদ উপলক্ষে আমরা খুব হৈচৈ করলাম। বিয়েটিয়ে এই-জাতীয় অনুষ্ঠান আমার ভাল লাগে না। গাদাগাদি ভিড়। মেয়েদের লোক-দেখানো আহ্লাদীপনা। খাবার টেবিলে তাড়াহুড়ো করে বসতে গিয়ে শাড়িতে রেজালার ঝোল ফেলে দেয়া। অসহ্য! কিন্তু বুবিনার গায়ে-হলুদ আমার কেন যে এত ভাল লাগল! বরের বাড়ি থেকে 'এলা' নামের একটি মেয়ে এসেছিল, সে ঢাকায় 'ও' লেভেলে পড়ে। ওর সঙ্গে আমার খুব বন্ধুত্ব হয়ে গেল। জন্মের বন্ধুত্ব। এর আগে আর কোনো মেয়ের সঙ্গে এত বন্ধুত্ব হয়নি। আমরা দু'জন এক ফাঁকে ছাদে চলে গেলাম। মেয়েটি নানান কথা বলতে লাগল। একটি ছেলের সঙ্গে তার ভাব হয়েছে। ছেলেটি মেডিক্যালে পড়ে। এক বিয়েবাড়িতে আলাপ হয়েছিল। খুব নাকি লাজুক ছেলে। আর দারুণ ভদ্র। এলা নিচু স্বরে বলল, 'জান ভাই, ও একবার যা অসভ্য কথা লিখেছিল আমাকে। আমি খুব রাগ করলাম। ওর সঙ্গে দেখা করাই বন্ধ করে দিলাম। টেলিফোন করলে টেলিফোন নামিয়ে রাখতাম। শেষে কী করল সে জান?'

'কী করল?'

'বলল সে বিষ খাবে। আমি তো জানি তাকে। খাবে বলেছে যখন তখন খাবেই। ছেলেরা দারুণ সেন্টিমেন্টাল হয় ভাই।'

'তখন তুমি কী করলে?'

'কী আর করব, দেখা করলাম।'

আমি ইতস্তত করে বললাম, 'অসভ্য কথাটা কী লিখেছিল?'

এলা তরল গলায় হেসে উঠল, 'দূর, তা বলা যায় নাকি? বিয়ের দিন তুমি আসবে তো? ঐ দিন তোমাকে ওর ঐ চিঠিটাই পড়াব। দেখবে ছেলেরা কী রকম অসভ্য হয়।'

১১

বুবিনার বিয়ের দিন আমরা কেউ ও-বাড়িতে গেলাম না। নীলুর জন্যেই যাওয়া হল না। সে কিছুতেই যাবে না এবং আমাকেও যেতে দেবে না।

'তুই না গেলে না যাবি, আমি যাই।'

'না', বললাম তো যেতে পারবি না।'

'কেন, অসুবিধেটা কী?'

'ওরা আজেবাজে কথা বলছিল, তোকে বলতে চাই না।'

'বলতে চাস না কেন?'

'কারণ, শুনলে তোর খারাপ লাগবে।'

'লাগুক খারাপ।'

নীলু মৃদু স্বরে বলল, 'ওরা বলছিল সেতারার চেহারার সঙ্গে নাকি ঐ লোকটির খুব মিল। আর সেতারা গান-বাজনাও ঐ লোকটির মতো জানে।'

'কখন বলছিল?'

'বুবিনার খালা বলছিল, আমি পাশের ঘরে ছিলাম।'

আমি চুপ করে রইলাম।

নীলু বলল, 'তোর মন খারাপ লাগবে বলেছিলাম না? তবুও তো শোনা চাই।'

আমি সে রাতে ঘুমোতে পারলাম না। বাবা ফিরলেন অনেক রাতে। সিঁড়িতে ধুপধাপ শব্দ হতে লাগল। রমজান ভাইয়ের গলা শোনা গেল, 'ছি, আপনের শরম করে না?'

'চুপ থাক।'

'আপনে চুপ থাকেন।'

ধুপ করে একটা শব্দ হল। বাবার গলা।

'ঘাড় ধরে বাড়ি থেকে বের করে দেব। শুয়োরের বাচ্চা। বেশি সাহস হয়েছে!'

'মেয়েরা বড় হইছে না? হায়া-শরম নাই?'

'চুপ থাক।'

'আপনে চুপ থাকেন।'

পানি ঢালার শব্দ। আকবরের মা উঠে গেল। ঝনঝন করে কী যেন পড়ল। আবার পানি ঢালা হচ্ছে। কী হচ্ছে এসব?

বাবা আজকাল বড্ড ঝামেলা করছেন। আবার একটা বিয়ে করলে তাঁর জন্যে

ভালই হত। নজমুল চাচা যাঁকে বাসায় নিয়ে এসেছিলেন সেই মহিলাটিকে আমার বেশ পছন্দ হয়েছিল। ছোটখাট মানুষ, লম্বা চুল। কথা বলেন টেনে টেনে। আমাদের সঙ্গে বেশ আগ্রহ করে কথা বললেন। নীলু যখন বলল, 'আচ্ছা, আপনি কি আমাদের দুজনকে আলাদা করতে পারবেন? আমার নাম নীলু ওর নাম বিলু। কিছুক্ষণ পর যদি আমরা দু'জন একরকম কাপড় পরে আসি তাহলে কি বলতে পারবেন কে বিলু কে নীলু?'

তিনি হাসিমুখে বললেন, 'আরে, এ মেয়ে তো দেখি খুব পাগলী!'

আমাদের দু'জনারই ভদ্রমহিলাকে খুব পছন্দ হল। শুধু সেতারা মুখ গোঁজ করে দূরে দাঁড়িয়ে রইল। তিনি ডাকলেন, 'এই, কী যেন নাম তোমার?'

সে উঠে চলে গেল।

আমরা তাঁকে বাগান দেখাবার জন্যে নিয়ে গেলাম। সেতারা কিছুতেই যাবে না। আমরা সেতারাকে ছাড়াই বাগানে বেড়াতে গেলাম। বাড়ির সঙ্গে লাগোয়া তেঁতুলগাছ দুটি দেখে তিনি খুব অবাক হলেন। আশ্চর্য হয়ে বললেন, 'বসতবাড়ির কাছে কেউ তেঁতুলগাছ লাগায় নাকি?'

নীলু বলল, 'লাগালে কী হয়?'

'বুদ্ধি কমে যায় । তেঁতুল খেলেও বুদ্ধি কমে।'

'এটা কিন্তু ঠিক না। রকিব ভাই খুব তেঁতুল খান। কিন্তু তাঁর খুব বুদ্ধি।'

'রকিব ভাই কে?'

নীলু চুপ করে গেল। তিনিও আর কিছু জিজ্ঞেস করলেন না। একবার শুধু বললেন, 'এত বড় বাড়িতে থাক, ভয় লাগে না?'

আমরা কিছু বললাম না। ভদ্রমহিলা যাবার আগে নীলুকে জড়িয়ে ধরে আদর করলেন এবং অত্যন্ত মৃদুস্বরে বললেন, 'তোমাদের মার সঙ্গে কি তোমাদের যোগাযোগ আছে?'

নীলু বলল, 'না, নেই।'

'তোমরা চিঠি লিখলেই পার। তোমরা কেন লিখবে না? তোমরা লিখবে।'

আমাদের খুব আশা ছিল ভদ্রমহিলার সঙ্গে বাবার বিয়ে হবে। কিন্তু বিয়ে হয়নি। বাবা কিছুতেই রাজি হলেন না। নজমুল চাচার উপর রেগে গিয়ে আজেবাজে কথা বলতে লাগলেন, 'তোমরা পেয়েছটা কী? আমাকে না বলে এইসব কী শুরু করেছ?'

নজমুল চাচাও কী সব যেন বললেন। তুমুল ঝগড়া বেধে গেল।

এক পর্যায়ে বাবা বললেন, 'যাও তুমি আমার বাড়ি থেকে, এক্ষুনি বিদেয় হও।'

নজমুল চাচাও চেঁচাতে লাগলেন, 'আমি তোমার দয়ার উপর আছি নাকি? নগদ ভাড়া দিয়ে থাকি।'

সে এক বিশ্রী অবস্থা! নজমুল চাচা সেই রাতেই ঠেলাগাড়ি নিয়ে এলেন। মালপত্র পাঠানো হতে লাগল। আমরা বসে বসে দেখলাম। ঠেলাগাড়ি এসেছে দুটি। নজমুল চাচার জিনিসপত্র তেমন কিছু নেই। ঘণ্টাখানেকের মধ্যে সব তোলা হয়ে গেল। আমরা দেখলাম, বাবা দাঁড়িয়ে আছেন সিড়ির কাছে আর নজমুল চাচা একটা বেতের ঝুড়ি হাতে নিয়ে নেমে যাচ্ছেন।

নীলু তখন ছুটে গিয়ে সিঁড়ির মাথায় তাঁকে জাপ্টে ধরল।

নজমুল চাচা বললেন, 'আরে মা, কী করিস তুই — ছাড় ছাড়।'

নীলু ছাড়ল না।

নজমুল চাচা বললেন, 'এ তো বড় মুসিবত হল দেখছি। আরে বেটি, কী করিস।'

তাঁর হাত থেকে বেতের ঝুড়ি ছিটকে পড়ে গেল।

নজমুল চাচা ভারী গলায় বললেন, 'এই, মালপত্র সব তুলে রাখ। সাবধানে তুলিস।'

নজমুল চাচা আমাদের কোনো আত্মীয় নন। দোতলার তিনটি কামরা ভাড়া নিয়ে আমাদের সঙ্গে আছেন পনেরো বছরের মতো। তাঁর স্ত্রী মারা গিয়েছেন ষোলো-সতেরো বছর আগে। একটিমাত্র মেয়ে, অল্প বয়সে বিয়ে দিয়েছিলেন। সেই মেয়ে নেদারল্যান্ড না কোথায় যেন থাকে। বছরে দু'তিনটি চিঠি দেয়। চিঠিতে খুব স্বাস্থ্যবান কিছু ছেলেমেয়ের ছবি থাকে। নজমুল চাচা সেই চিঠি পড়ে গম্ভীর হয়ে বলেন, 'উফ, অ্যারন বাংলাটা এখনো শেখে নাই। খুব খারাপ, খুব খারাপ!'

অ্যারন তাঁর নাতনী।

নীলু অনেক কিছুই করতে পারে যা আমি পারি না। নজমুল চাচা যখন চলে যাচ্ছিলেন আমার খুব ইচ্ছে হচ্ছিল ছুটে গিয়ে তাঁকে ফেরাই। কিন্তু আমি গেলাম না, ছুটে গেল নীলু। আমরা দু'জন দেখতে অবিকল একরকম, কিন্তু দু'জন সম্পূর্ণ আলাদা মানুষ হয়ে উঠছি। আমরা এরকম কেন?

কাল রাতে আমি চমৎকার একটি স্বপ্ন দেখেছি। এমন চমৎকার স্বপ্ন যে ঘুম ভেঙে খানিকক্ষণ কাঁদলাম। একবার ইচ্ছে হল নীলুকে ডেকে তুলি। স্বপ্নের কথাটা বলি ওকে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত কিছুই করলাম না। গলা পর্যন্ত চাদর টেনে চুপচাপ শুয়ে শুয়ে স্বপ্নটার কথা ভাবলাম। ঘুমের মধ্যে যে স্বপ্নটিকে অর্থবহ মনে হচ্ছিল জেগে থেকে তা আর মনে হল না। আমি দেখেছিলাম একটি নদী। নদীর চারপাশে ঘন বন। কিন্তু কিছুক্ষণ পর বন অদৃশ্য হয়ে গেল। দেখলাম শুধুই নদী। সেই নদীতে বালি চিকচিক করছে। কোথাও কেউ নেই। আমার একটু ভয়ভয় করছে। তবু আমি নদীতে নামতেই নদীটি আমাদের নানার বাড়ির পুকুর হয়ে গেল। সে পুকুরে ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কুমির কুমির খেলছে। স্বপ্নে নদীর পুকুর হয়ে যাওয়াটা খুবই স্বাভাবিক মনে হচ্ছিল। আমি একটুও অবাক না হয়ে ছেলেমেয়েগুলির সঙ্গে কুমির কুমির খেলতে লাগলাম। একটি পাজি ছেলে ডুব-সাঁতার দিয়ে কেবলই আমার পা জড়িয়ে গভীর জলের দিকে টেনে নিতে চাচ্ছিল। আমার রাগ লাগছিল, কিন্তু কিছুই বলছিলাম না। কারণ স্বপ্নের মধ্যে মনে হচ্ছিল এই ছেলেটি যেন আমার স্বামী। একসময় ছেলেটি টেনে আমাকে মাঝপুকুরে নিয়ে গিয়ে চেঁচিয়ে বলল, 'এই সুশী, তোমাকে এখন ছেড়ে দিই?'

কেন মানুষ এমন অদ্ভুত সব স্বপ্ন দেখে? আমি জেগে এই ছেলেটির মুখ খুব মনে করবার চেষ্টা করলাম, কিছুতেই মনে পড়ল না। শুধু মনে পড়ল ছেলেটির চোখগুলো মেয়েদের চোখের মত টানা-টানা। আর ওর হাত দুটি লম্বা এবং খুব ফরসা। কে জানে এ রকম একটি ছেলের সঙ্গেই হয়তো আমার বিয়ে হবে। সে আমাকে আদর করে ডাকবে 'সুশী'। কী আশ্চর্য, এরকম একটা অদ্ভুত নাম এল কোত্থেকে? ভাবতে ভাবতে আবার আমার চোখ ভিজে উঠল। বাকি রাত এক ফোঁটা ঘুম এল না।

এত ভোরে কখনো আমি আগে উঠিনি। অদ্ভুত লাগছিল আমার। আলোটাই অন্য রকম। কেমন মায়া-মায়া আলো, স্বপ্নের মধ্যে যেরকম আলো দেখা যায় সেরকম। আমি নিচে বাগানে নেমে গেলাম। কদমগাছের নিচটায় তখনো খুব অন্ধকার। আমার একটু

ভয়- ভয় করছিল। কিন্তু গাছের নিচে এসে দাঁড়ানোমাত্র দেখলাম নীলু জেগে উঠেছে। টুথব্রাশ নিয়ে ঘুমঘুম চোখে সিঁড়ি দিয়ে নামছে। নীলু সবসময় খুব ভোরে ওঠে। কিন্তু সে যে এ-রকম অন্ধকার ভোর তা জানা ছিল না। আমি ডাকলাম, 'এ্যাই নীলু।'

নীলু আমাকে দেখতে পেল না। সে অবাক হয়ে চারদিকে তাকাতে লাগল। তারপর একটি কাণ্ড করল, 'মা এসেছে মা এসেছে' বলে ছুটে গেল গেটের দিকে।

আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'এ্যাই নীলু, কী হয়েছে রে?'

নীলু খুব অবাক হল। বেশ কিছুক্ষণ কথা বলতে পারল না। একসময় থেমে থেমে বলল, 'আমি ভাবলাম মা বুঝি। গলার স্বর অবিকল সেরকম লাগল।'

নীলুর কি কিছুটা আশাভঙ্গ হয়েছে? কী জানি, হয়তো হয়েছে। মা'র কথা সে হয়তো সারাক্ষণই ভাবে। মুখে বলে না।

'আজ এত সকালে উঠেছিস যে?'

'দেখলাম একদিন উঠে কেমন লাগে।'

'কেমন লাগে?'

'ভালই তো।'

নীলু চুপচাপ দাঁত ঘষতে লাগল। আমি বললাম, 'তুই কি মা'র কথা খুব ভাবিস?'

'নাহ্।'

'তা হলে আজ এরকম ছুটে গেলি যে?'

'আমার ইচ্ছা হয়েছে গিয়েছি। তোর তাতে কী?'

'রাগ করছিস কেন?'

নীলু জবাব না দিয়ে সামনে এগিয়ে গেল। তখন মনে পড়ল নীলুর সঙ্গে আমার ঝগড়া চলছে। গত এক সপ্তাহ ধরে কথাবার্তা বন্ধ। ঝগড়ার কারণটি অতি তুচ্ছ। আমি নীলুর একটি চিঠি খুলে পড়ে ফেলেছি। কিছুই নেই সে চিঠিতে। ছয় লাইনের একটা চিঠি। নীলুর পরিচিত প্রফেসরটি লিখেছেন। সত্যজিৎ রায়ের ফেলুদার যে বইটি নীলু পড়তে চেয়েছে সেটি তিনি দোকানে খুঁজে পাননি। পেলেই পাঠাবেন।

এমন কী আছে সেই চিঠিতে যে নীলু রাগ করল ? কিন্তু সে এমন ভাব করতে লাগল যেন আমি তার কাছে লেখা খুব গোপন একটি প্রেমপত্র পড়ে ফেলেছি। আমি যখন বললাম, 'কী আছে এই চিঠিতে যে তুই এরকম করছিস?'

'যাই থাকুক, কেন আমার চিঠি পড়বি?'

'বেশ, আর পড়ব না।'

'পড়বি না শুধু না, তুই আমার ঘরেও কোনোদিন ঢুকবি না।'

'বেশ, ঢুকব না।'

'আর আমার সঙ্গে কথাও বলবি না।'

'ঠিক আছে, বলব না।'

ব্যাপারটা এখানেই শেষ হল না। সন্ধ্যাবেলা বাবা প্রেস থেকে ফেরার সঙ্গে সঙ্গে সে নালিশ করল, 'বাবা, বিলু আমার সব চিঠিপত্র পড়ে ফেলে।'

'তাই নাকি?'

'হ্যাঁ। তুমি ওকে ডেকে নিষেধ করে দাও।'

'ঠিক আছে, করব।'

'না, এখনই করো।'

বাবা আমাকে ডেকে পাঠালেন। শান্ত স্বরে বললেন, 'একজনের কাছে লেখা চিঠি অন্যের পড়াটা ঠিক না মা।' আমি লজ্জায় বাঁচি না। নীলুটা এমন হচ্ছে কেন কে জানে! আগে এরকম ছিল না। তার কাছে চিঠি এলেই আমাকে সে চিঠি পড়তে হত। একবার সে পেনফ্রেন্ডশিপ করল বুলগেরিয়ার কী একটা ছেলের সঙ্গে। সেই ছেলেটা সবুজ রঙের কাগজে লম্বা লম্বা চিঠি লিখত ভুল ইংরেজিতে। চিঠির শেষে একটা ঠোঁটের ছবি এঁকে লিখত-Kiss-। নীলু আমাকে সেই চিঠি পড়তে দিয়ে বলত, 'মাগো, কী অসভ্য!' নীলুর সেইসব চিঠির জবাবও লিখে দিতাম আমি। একদিন সে লজ্জায় লাল হয়ে বলল, 'বিলু, চিঠির শেষে তুইও লিখে দে "Kiss"'। ঐ বাঁদরটার সাথে তো আর দেখা হচ্ছে না। কী বলিস? আমি লিখলাম "Kiss"। নীলু বহু যত্নে একটা ঠোঁটের ছবিও আঁকল। তারপর ঐ ছেলে তার ছবি পাঠাল। মাথায় চুল নেই একটিও। গালে এত বড় একটা আঁচিল। হাতির কানের মতো বড় বড় কান। ছবি দেখে দারুণ রেগে গেল নীলু। ছেলেটি লিখেছিল সুযোগ পেলেই সে তার বাংলাদেশি পেনফ্রেন্ড নীলুর সঙ্গে দেখা করতে আসবে। নীলু বলল, 'লিখে দে, হাঁদারাম, তুমি বাংলাদেশে এলে তোমার ঠ্যাং ভেঙে দেব। বাঁদর কোথাকার!'

নীলু চিঠি লেখা বন্ধ করে দিলেও আমি চালিয়ে যেতে লাগলাম। মজাই লাগত আমার। বানিয়ে বানিয়ে কত কিছু যে লিখেছি! যেমন একবার লিখলাম, কাল আমরা সমুদ্রে নৌকা নিয়ে বেড়াতে গিয়েছিলাম। কী যে সুন্দর সমুদ্র আমাদের! খুব মজা হয়েছে। একবার সে লিখল, তোমার কি কোনো ছেলেবন্ধু আছে? আমি লিখলাম, হ্যাঁ আছে। আমার ছেলেবন্ধুটি একজন কবি। সে আমাকে নিয়ে অনেক কবিতা লিখেছে।

ছেলেটা সত্যি সত্যি হাঁদারাম। যা লিখতাম তাই বিশ্বাস করত। তারপর একদিন সে হঠাৎ লিখে বসল, আসছে সামারে আমি বাংলাদেশে আসব। কী সর্বনাশ! ভয়ে আমি এবং নীলু দুজনই অস্থির। এ কী ঝামেলা হল! কী যে ভয়ে ভয়ে কেটেছে সেই সময়টা! রাতে ভাল ঘুম পর্যন্ত হত না। নীলু অবশ্যি খুব একটা ভয় পায়নি। ও বলত, 'খামোকা ভয় পাচ্ছিস, আসবে–টাসবে না। আর যদি এসেও পড়ে, তা হলে বলব নীলু নামের মেয়েটির বিয়ে হয়ে গেছে।'

ছেলেটি অবশ্যি আসেনি এবং চিঠিপত্রও দেয়নি আর। হয়তো অন্য কোনো দেশের কোনো মেয়ের সঙ্গে আবার পেনফ্রেন্ডশিপ করেছে।

নীলুর যন্ত্রণায় আরো সব চিঠি লিখতে হয়েছে আমাকে। একবার সে বলল, 'খুব ভাষা-টাষা দিয়ে একটা চিঠি লিখে দে তো বিলু।' কার কাছে, কী — কিছুই বলবে না। লিখলাম একটা চিঠি। সেটা তার পছন্দ হল না। আবার একটা লিখলাম। কত কাণ্ড হল সে চিঠি নিয়ে! ক্লাসের মেয়েরা সেই চিঠির লাইন বলে বলে নীলুকে খ্যাপাতে লাগল। কোথায় পেয়েছে তারা সেই চিঠি কে জানে! নীলু যে-ছেলেকে লিখেছিল সে-ই হয়তো বলে দিয়েছে। নীলু বাসায় এসে কেঁদে-টেঁদে অস্থির। সেই সময় নীলুর সঙ্গে খুব ভাব ছিল আমার। নীলু হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে গেল। আমার কোনো বন্ধুটন্ধু নেই। নীলু দূরে সরে যেতেই আমি একা হয়ে গেলাম। এরকম একটি অদ্ভুত সুন্দর সকালে একা থাকতে ইচ্ছে করে না। আমি নীলুর খোঁজে বাগানের পেছনের দিকে এসে দেখি নীলু কাঁদছে। কী আশ্চর্য! আমি বললাম, 'কী হয়েছে রে?'

'কিছু হয়নি।'

'কাঁদছিস কেন?'

'তোর কাছে সবকিছু বলতে হবে নাকি?'

'বললে দোষ কী?'

নীলু কোনো জবাব না দিয়ে গম্ভীর মুখে বাগান ছেড়ে চলে গেল। সকালটা হঠাৎ করেই অন্যরকম হয়ে যাচ্ছে। লোকজন সবাই জেগে উঠেছে। রমজান ভাই ঘটাং ঘটাং করে টিউবওয়েলে পানি তুলছে। আকবরের মা ময়লা থালা-বাসন এনে জমা করছে টিউবওয়েলের পাশে। একসময় ঝগড়া লেগে গেল দু'জনের মধ্যে। এরা দুজন দু'জনকে সহ্যই করতে পারে না। তবু কেমন করে থাকে একসঙ্গে? এদের চেঁচামেচিতেই বোধহয় বাবার ঘুম ভাঙল। বাবা বারান্দায় এসে দাঁড়াতেই চারদিক আবার চুপচাপ। বাবা বললেন, 'আমাকে চা দাও এক কাপ।' এরা দু'জনে কেউ কোনো উত্তর করল না। আকবরের মা বেড়ালের মত ফ্যাঁসফ্যাঁস করে কী বলতেই আবার বেধে গেল রমজান ভাইয়ের সঙ্গে। বাবা দাঁড়িয়ে রইলেন চুপচাপ। আজকাল কেউ আর বাবাকে তেমন গ্রাহ্য করে না। আমি এগিয়ে এসে বললাম, 'আমি বানিয়ে আনছি বাবা।'

'তুই আবার চা বানাতেও জানিস নাকি?'

'জানব না কেন?'

বাবা অবাক হয়ে বললেন, 'কার কাছে শিখলি?'

'কী আশ্চর্য কাণ্ড, চা বানানো আবার শিখতে হয় নাকি?' বাবা এরকম ভান করতে লাগলেন যেন খুব অবাক হয়েছেন।

'আর কী জানিস, রান্নাবান্না করতে পারিস? ভাত-মাছ এইসব?'

'নাহ্।'

'এইগুলিও শিখে ফেল। রমজানকে বল শিখিয়ে দিতে।'

'আচ্ছা, বলব।'

'নীলুকে সঙ্গে নিয়ে শিখে ফেল। একদিন বিয়েটিয়ে হবে। রান্নাবান্না না জানলে বিয়ে দেয়াই যাবে না, হা হা হা।'

অনেক দিন পর বাবা হাসলেন। মানুষের হাসির মতো সুন্দর কি কিছু আছে? বাবার হাসির সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে রোদ ঝলমল করে উঠল।

মা একটা কথা সবসময় বলতেন, 'মানুষ যখন হাসে তখন তার সঙ্গে সমস্ত পৃথিবী হাসে। কিন্তু সে যখন কাঁদে, তার সঙ্গে আর কেউ কাঁদে না। কাঁদতে হয় একা একা।'

চা বানাতে বানাতেই শুনলাম সেতারা গলা সাধা শুরু করেছে। নিসা গামা পামা গামা। গামা পামা গারে সা। গান-টান কিছু না, সামান্য সারে গামা, কিন্তু কী যে ভাল লাগছে শুনতে!

বাবাকে চা নিয়ে দিতেই বাবা বললেন, 'ভাবছি তোদের নিয়ে কোথাও ঘুরেটুরে আসব। যাবি নাকি?'

'কোথায়?'

'গারো পাহাড়ে গেলে কেমন হয়? জাড়িয়া জাঞ্জাইল লাইনে বেশি দূর হবে না। ছয়-সাত ঘণ্টা লাগবে ট্রেনে। বনবিভাগের একটা রেস্ট হাউস আছে। যাবি নাকি?'

'যাব বাবা।'

'জায়গাটা সুন্দর। রাতের বেলা একটু ভয়ভয় লাগে।'

'কেন?'

'বন্য হাতির শব্দটব্দ পাওয়া যায়। এখন বোধহয় আর সেরকম নেই। তোরা যদি যেতে চাস তাহলে একটা প্রোগ্রাম করি।'

'যাবে কবে?'

'দুই দিনের মাত্র ব্যাপার, একটা তারিখ করলেই হয়। তুই নীলুকে জিজ্ঞেস করে আয় ও যাবে কি না।'

নীলু সব শুনে লাফিয়ে উঠল। বেড়ানোর ব্যাপারে নীলুর মতো উৎসাহী আর কেউ নেই। গারো পাহাড় দেখতে যাওয়া হবে শুনেই তার সব রাগ পড়ে গেল। নানানরকম পরিকল্পনা করে ফেললাম আমরা। যেমন সম্পাদের ক্যামেরাটা নিয়ে যাব এবং খুব ছবি তুলব। সেখানে আমরা দু'জনেই শাড়ি পরব। এবং এই উপলক্ষে বাবাকে বলব দুটি শাড়ি কিনে দিতে। বনবিভাগের রেস্ট হাউসে রাতের খাবার-টাবার হয়ে যাবার পর বাবাকে বলব গল্প বলার জন্যে। বাবা অবশ্যি গল্পটল্প তেমন বলতে পারেন না। কিন্তু তাতে কিছু যায় আসে না। অনেক রাত পর্যন্ত আমরা হারিকেন জ্বালিয়ে বসে থাকব। হারিকেনের আলো কী যে ভাল লাগে আমার!

একেকটা দিন এমন অন্যরকম হয়। মনে হয় দুঃখ-টুঃখ সব বানানো ব্যাপার। চারদিকে শুধু সুখ এবং সুখ। সন্ধ্যাবেলা আমরা দু'বোন শাড়ি পরে বারান্দায় হাঁটছি, নজমুল চাচা ডেকে পাঠালেন।

'কি রে বেটিরা, শুনলাম দল বেঁধে নাকি পাহাড়ে যাচ্ছিস?'

'জ্বি চাচা।'

'তা আমাকে একবার জিজ্ঞেস পর্যন্ত করলি না? আমারও তো পাহাড়-টাহাড়ে যেতে ইচ্ছে করে।'

'সত্যি সত্যি যাবেন আমাদের সাথে?'

'এরকম পরীর মতো মেয়েদের পাহারা দিয়ে রাখার জন্যেও তো লোকজন দরকার।'

পরের কয়েকটি দিন আমাদের দারুণ উত্তেজনার মধ্যে কাটল। একদিন শুনলাম বন-বিভাগের ডাকবাংলোটা পাওয়া গেছে। তারপর দিন-ক্ষণ ঠিক হল। ন'তারিখে ভোরের ট্রেনে যাব, পৌঁছব বিকাল-নাগাদ। নজমুল চাচা যাবেন। রমজান যাবে। বাবার প্রেসের একজন কম্পোজিটর মাখন মিয়া, সেও যাবে। কারণ মাখন মিয়ার বাড়ি ঐ অঞ্চলে, সে সব খুব ভাল চেনে।

আট তারিখ রাতে বাবা বাড়ি ফিরলেন না। রাত একটায় নজমুল চাচা খোঁজ নিতে গেলেন। আমরা তিন বোন বসার ঘরে বসে রইলাম চুপচাপ। নজমুল চাচা ফিরলেন দু'টার দিকে এবং হালকা গলায় বললেন, 'কাজে আটকা পড়ে গেছে, সকালবেলাতেই চলে আসবে। ঘুমিয়ে পড়।'

নীলু শান্ত স্বরে বলল, 'বাবার কী হয়েছে বলেন?'

'কী আবার হবে। কাজ থাকে না মানুষের?'

নজমুল চাচা রেগে গেলেন। নীলুও রেগে গেল।

'বাবার কী হয়েছে বলেন।'

'কাল সকালে আসবে, তখন জিজ্ঞেস করিস। কিছু হয়নি, ভালই আছে।'

নীলু তেজী গলায় বলল, 'আপনাকে এখন বলতে হবে।'

'এরকম করে তুই আমার সঙ্গে কথা বলছিস কেন?'

নীলু কেঁদে ফেলল। বাবা ফিরলেন পরদিন দুপুরে। কোর্ট থেকে জামিনে ছাড়া পেয়ে। তাঁর রাত কেটেছিল থানা-হাজতে। মদ খেয়ে খুব নাকি হৈচৈ করছিলেন বা এই-জাতীয় কিছু। খুবই কেলেঙ্কারি ব্যাপার। আমরা সপ্তাহখানেক কেউ স্কুলে গেলাম না। ঠিক করলাম বাবার সঙ্গে কেউ কোনো কথা বলব না। ডাকলেও সাড়া দেব না। এমন ভাব করব যেন শুনতে পাইনি। কোনো লাভ অবশ্যি তাতে হল না। বাবা আমাদের ডাকাডাকি বন্ধ করে দিলেন। যতক্ষণ বাসায় থাকেন চুপ করে থাকেন।

একদিন দেখি একটি টেলিভিশন কিনে আনলেন। সেতারার খুব শখ ছিল টিভির। কথা ছিল সেতারার আগামী জন্মদিনে ঢাকা থেকে এটি কিনে আনা হবে এবং সেই উপলক্ষে আমরা সবাই দল বেঁধে ঢাকা যাব। তিনি বোধহয় আমাদের সঙ্গে ভাব করবার জন্যেই আগেভাগে কিনে ফেললেন। সন্ধ্যাবেলা টিভি চালু হল। আমরা কেউ দেখতে গেলাম না। আকবরের মা এবং রমজান ভাই মোড়া পেতে টিভির সামনে রাত এগারোটা পর্যন্ত বসে রইল।

বাবার কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেলাম আমরা। সেই সময় বড় মামার চিঠিতে জানলাম মা'র একটি ছেলে হয়েছে। ছেলের নাম কাজল।

মায়ের শরীর খুব খারাপ। ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে আছেন। কী যে কষ্ট হল আমার। কত লক্ষ বার যে বললাম — মা ভাল হয়ে যাক। মাকে ভাল করে দাও। রোজ রাতে তাঁকে স্বপ্নে দেখতাম। রক্তশূন্য একটি লম্বাটে ফর্সা মুখ। চাদর দিয়ে গলা পর্যন্ত ঢাকা। স্বপ্ন দেখে রোজ রাতেই কাঁদতাম। আমরা তিন বোনই নিশ্চিত ছিলাম মা মারা যাবেন। কিন্তু তিনি সুস্থ হয়ে উঠলেন। চিঠি লিখলেন মা নীলুকে। নীলু তার কোনো চিঠি আমাকে পড়তে দেয় না। কী লেখা ছিল সে চিঠিতে তা জানলাম না। নীলু শুধু বলল, 'কাজল খুব বিরক্ত করে, রাতে মাকে ঘুমাতে দেয় না।'

১২

এসএস সি পরীক্ষায় খুব ভাল রেজাল্ট করলাম। এত ভাল যে সেলিনা আপা এক দিনের জন্যে স্কুল ছুটি দিলেন, এবং একটি গোল্ড মেডেল দেবার ব্যবস্থা করলেন। খায়রুন্নেসা গোল্ড মেডেল। খায়রুন্নেসা তাঁর মায়ের নাম। এই গোল্ড মেডেলটি সেবারই প্রথম ঘোষণা করা হল। আমাদের স্কুলের কোনো ছাত্রী যদি এসএস সি পরীক্ষায় সমস্ত বোর্ডে প্রথম তিনজনের মধ্যে থাকতে পারে তবেই সে এই গোল্ড মেডেল পাবে। ময়মনসিংহ ডিস্ট্রিক্ট বোর্ড থেকে আমাকে পাঁচশ' টাকা দেয়া হল। শুধু তাই না, একদিন সকালবেলা একজন স্থানীয় সংবাদদাতা আমার ইন্টারভ্যু নিতে এলেন। নজমুল চাচার উৎসাহের সীমা নেই। 'শাড়ি খুলে একটা কামিজ-টামিজ পর, বয়স কম দেখা যাবে। কানের দুলগুলি খুলে ফেল তো, ভাল ছাত্রীদের এইসব গয়না-টয়না মানায় না। মুখে হালকা করে পাউডার দে।'

ইন্টারভ্যু পর্ব সমাধা হতে অনেক সময় লাগল। বেশির ভাগ প্রশ্নের উত্তর দিতে লাগলেন নজমুল চাচা। যেমন ভদ্রলোক যখন জিজ্ঞেস করলেন, 'দৈনিক ক'ঘণ্টা

পড়াশুনা করতে?' আমি কিছু বলার আগেই নজমুল চাচা বললেন, 'ঘন্টার কি কোনো হিসাব আছে ভাই? রাতদিনই পড়ছে। যখনই দেখি তখনি মুখের ওপর একটা বই। হা-হা-হা।'

ভদ্রলোক জিজ্ঞেস করলেন, 'কোনো প্রাইভেট টীচার ছিল?'

নজমুল চাচা আমাকে থামিয়ে দিয়ে বললেন, 'এই মেয়ের প্রাইভেট টিচার লাগে! কি যে বলেন ভাই!'

কথাটি পুরোপুরি মিথ্যা। আজিজ স্যার আমাকে আর নীলুকে সপ্তাহে চারদিন অঙ্ক করাতেন। নলিনীবাবু স্যার পড়াতেন ইংরেজি।

'পাঠ্য বই ছাড়া বাইরের বই কেমন পড়েছ তুমি?'

'বাইরের বই তো বেশি পড়েছে। রবীন্দ্রনাথ টলস্টয় সব আপনার নিচের ক্লাসেই পড়ে শেষ করেছে। হা-হা-হা।'

ইন্টারভ্যু হল আসলে নজমুল চাচার সঙ্গে। আমি শুধু হাসিমুখে তাঁর পাশে রইলাম। এবং সেই ইন্টারভ্যুর খানিকটা ছাপাও হল একটি ইংরেজি পত্রিকায়। তার পরপরই একটি চিঠি পেলাম আমরা দু'বোন।

কল্যাণীয়াসু নীলু অথবা বিলু

তোমাদের দু'বোনের একজনের ছবি দেখলুম পত্রিকায়। ছবির সঙ্গে ডাকনাম দেয়া ছিল না। কাজেই বুঝতে পারছি না ছবিটি কার?

যার ছবি তার জন্যে আমার আন্তরিক অভিনন্দন। মফস্বলের একটি স্কুল থেকে এমন চমৎকার রেজাল্ট করা দারুণ ব্যাপার। আমার খুবই ভাল লাগছে। এর মধ্যে একবার ময়মনসিংহ এসেছিলাম। তোমাদের বাড়ির সামনে দিয়ে হেঁটে গিয়েছি। গেট বন্ধ ছিল। কাজেই ভেতরে আর ঢুকিনি। পরে ভেবেছি গেট খুলে ঢুকলেই হত।

অনেক সময় আমরা যা করতে চাই করতে পারি না। কেন পারি না তাও জানি না। পরে তা নিয়ে কষ্ট পাই। ঠিক না?

আমার কেন যেন মনে হচ্ছে তোমরা দু'বোন আমার চিঠি পড়ে খুব হাসবে। অবশ্যি একটি ক্ষীণ আশা যে এই চিঠিটি তোমাদের হাতে পৌঁছবে না। কারণ তোমাদের ঠিকানা আমার জানা নেই। শুধু জানি তোমাদের দু'বোনের একজন হচ্ছ নীলু, একজন বিলু এবং তোমাদের বাড়িটির নাম 'উত্তর দিঘি'। এরকম সংক্ষিপ্ত ঠিকানায় চিঠি যাওয়ার কথা নয়। ঠিক না?

রকিব হাসান

কত অসংখ্যবার যে সেই চিঠি আমি পড়লাম। প্রতিবারই আমার মনে হয়েছে এই চিঠিতে যা লেখা হয়েছে তার বাইরেও কিছু আছে। আর একবার পড়লেই তা বোঝা যাবে।

চিঠিটি নজমুল চাচাও পড়লেন এবং বললেন, 'বিশিষ্ট ভদ্রলোক। খুব আদব-কায়দা। একটা ভাল সংবাদ পেয়েছে, সঙ্গে সঙ্গে চিঠি দিয়েছে। এইসব ভদ্রতা কি দেশে আজকাল আছে? সংবাদ শুনলে লোকজন আজকাল বিরক্ত হয়। মা, সুন্দর করে গুছিয়ে একটা চিঠি লেখো। বানান-ভুল যেন না থাকে। সাবধান! ডিকশনারি দেখবে। আর

শোনো, এই চিঠি যত্ন করে তুলে রাখবে। রেজাল্ট নিয়ে যত চিঠি যত টেলিগ্রাম আসবে সব তুলে রাখবে। আলাদা একটা ফাইল করে রাখবে। আমি অফিস থেকে ফাইল নিয়ে আসব।'

নীলু চিঠিটির শুরুটা পড়েই গম্ভীর মুখে বলল, 'তোর চিঠি আমাকে দিচ্ছিস কেন? আমি অন্যের চিঠি পড়ি না।'

'পড়া যাবে না এমন কিছু এখানে লেখা নেই।'

'না থাকুক।'

নীলু পাশ ফিরে বালিশে মুখ ঢাকল। তার বেশ ক'দিন ধরে জ্বর যাচ্ছে। তেমন কিছু নয়, কিন্তু বিছানা ছেড়ে উঠছে না। আমার ধারণা, সে আশা করেছিল তার রেজাল্ট অনেক ভাল হবে। রেজাল্ট মোটেও ভাল হয়নি। ফার্স্ট ডিভিশন দেখা শেষ করে আমরা যখন সেকেন্ড ডিভিশর্ন দেখতে শুরু করেছি সে তখন দৌড়ে পালিয়েছে। নজমুল চাচা তাকে পাসের খবর দিতেই সে কেঁদে-টেদে একটা কাণ্ড করেছে।

'পরের বার অনেক ভাল হবে দেখবি।'

'আর দেখতে হবে না।'

'সবাই কি আর ফার্স্ট-সেকেন্ড হয় নাকি রে বোকা? আমি নিজে তিন বারের বার ম্যাট্রিক পাস করলাম। কিন্তু আইএ-তে আবার ফার্স্ট ডিভিশন।'

'থাক, আপনাকে আর বকবক করতে হবে না।'

বাবা নিজে এসেও সান্ত্বনা দিতে চেষ্টা করলেন।

'আরে, সেকেন্ড ডিভিশন খারাপ নাকি?'

'খারাপ হবে কেন? খুব ভাল, তুমি যাও তো এখন।'

নীলুকে আমরা খুব শক্ত মেয়ে হিসেবে জানতাম। এই ব্যাপারটায় যে সে এতটা মন-খারাপ করবে ভাবতেও পারিনি। কিছু দিন পরই সে জ্বরে পড়ে গেল। অল্পদিনের জ্বরেই শুকিয়ে-টুকিয়ে অন্যরকম হয়ে গেল। এক রাতে ঘুমুতে এল আমার ঘরে। একা একা তার নাকি ভয় লাগছে। কে যেন বারবার তার জানালার সামনে এসে দাঁড়াচ্ছে। আমরা দু'জন অনেকদিন পর একসঙ্গে ঘুমুতে গেলাম। সেতারা শুয়েছে একা একটি খাটে। আমরা দু'জন একটিতে। আমি নরম স্বরে বললাম, 'এত মন খারাপ করেছিস কেন?'

'জানি না কেন।'

'তুই তো পড়াশোনাই করিসনি, রেজাল্ট কোত্থেকে ভাল হবে।'

'তা ঠিক।'

নীলু একটি হাত আমার গায়ের ওপর রেখে বলল, 'দু'জন এবার আলাদা হয়ে যাব। তুই যাবি ঢাকায় আর আমি এখানে কোনো ভাঙা কলেজে।'

'আমি ঢাকায় যাব না, এইখানে থাকব।'

'তুই ঢাকায় পড়তে যাবি এটা তো জানা কথা। সেটাই ভাল। তুই এত ভাল ছাত্রী, তোর তো ভাল কলেজেই যাওয়া উচিত।'

আমরা দু'জন হালকা গলায় নানান কথাবার্তা বলতে লাগলাম। অনেক রাতে শুনলাম বাবা ঘরে ফিরেছেন। গুনগুন করে কী বলছেন। রমজান ভাই রাগী গলায় কী-সব বলছেন। নীলু ছোট্ট একটা নিঃশ্বাস ফেলে বলল, 'চল ঘুমিয়ে পড়ি।'

প্রায় ঘুমিয়েই পড়েছি, তখন নীলু বলল, 'বিলু, একটা কথা। জেগে আছিস তো?'

'হুঁ।'

'আমার গা ছুঁয়ে প্রতিজ্ঞা করতে হবে তোকে।'

'কী প্রতিজ্ঞা?'

নীলু চুপ করে রইল। আমি অবাক হয়ে বললাম, 'কিসের প্রতিজ্ঞা?'

'ঢাকায় গিয়ে রকিব ভাইয়ের সঙ্গে দেখা করতে পারবি না।'

'এসব কী বলছিস, আমি দেখা করব কেন?'

'আর ওর চিঠির জবাব দিবি না।'

আমি স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। নীলু কাঁদতে শুরু করল। ফোঁপাতে ফোঁপাতে বলল, 'কথা দে আমাকে, আমার গা ছুঁয়ে বল।'

'কী যে কাণ্ড তোর!'

আমি নীলুকে জড়িয়ে ধরলাম। এমন বোকা কেন নীলুটা?

সেদিন আকাশের রঙ ছিল ঘন নীল।

আমরা এম্নিতে কখনো আকাশ দেখি না। আমরা আকাশের দিকে তাকাই মন-খারাপ হলে। মন বিষণ্ণ হলে আকাশও বিষণ্ণ হয়। হেমন্তের এই ঝকঝকে সকালে আকাশটা অসম্ভব বিষণ্ণ হয়ে গেল। আমি তবু মুখে হাসি টেনে রাখলাম। ভোরবেলা নাশতা খাবার সময় খুব হাসিখুশি থাকতে চেষ্টা করলাম। নজমুল চাচাও আজ আমাদের সঙ্গে নাশতা খেলেন। নীলু বসে রইল পাথরের মতো মুখ করে। বাবা একবার সাবধানে চলাফেরার কথা বললেন।

'একা একা কোথাও যাবার দরকার নেই। কোথাও যেতে হলে বন্ধুবান্ধব কাউকে সঙ্গে নিবি।'

নজমুল চাচা বললেন, 'চিন্তার কিছু নেই, সফদর সাহেব প্রতি শুক্রবারে এসে বাসায় নিয়ে যাবেন। আর ছুটিছাটা হলে নিজে ময়মনসিংহে এসে পৌঁছে দেবেন। অতি ভদ্র সজ্জন ব্যক্তি।'

আমি তাদের কথায় হ্যাঁ-না কিছুই বললাম না। ঠিক যখন যাবার সময় হল তখন ইচ্ছে করল চেঁচিয়ে বলি — আমি এইখানেই থাকব। এখানকার কলেজে ভর্তি হব। কিছুই বলা হল না।

নজমুল চাচা আমাকে সঙ্গে নিয়ে ট্রেনে উঠলেন। ট্রেন ছাড়তে খুব দেরি করতে লাগল। বাবা প্ল্যাটফরমে দাঁড়িয়ে রইলেন ক্লান্ত ভঙ্গিতে। নীলু সেতারা কেউ আসেনি। ওরা খুব কাঁদছিল। বাবা বলেছিলেন, 'তোরা আসিস না। তোরা থাক এখানে। আর এত কান্নাকাটির কী আছে! দুই মাস পরে তো আসছেই।'

ট্রেন ছেড়ে দেবার সময় বাবা মনে হল খুব অবাক হয়ে পড়েছেন। যেন ভাবতে পারেননি ট্রেন একসময় ছেড়ে দেবে। তিনি জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে আমার বাঁ হাত শক্ত করে চেপে ধরে ট্রেনের সঙ্গে সঙ্গে আসতে লাগলেন। নজমুল চাচা বললেন, 'আরে করেন কী, হাত ছেড়ে দাও।' বাবা হাত ছাড়লেন না। যেন শেষ মুহূর্তে তাঁর মনে হল আমি চলে যাচ্ছি। তিনি ট্রেনের লোকজন, প্ল্যাটফরমের গাদাগাদি ভিড় সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে ফুঁপিয়ে উঠলেন, 'আমার আম্মি। আমার রাত্রিমণি। ওরে বেটি টুনটুন।'

আমি পাথরের মতো মুখ করে বসে রইলাম। পৃথিবীতে এত কষ্ট কেন থাকে? কেন

এত দুঃখ চারদিকে? জানালার ওপাশে কী সুন্দর সব দৃশ্য! গাঢ় নীল রঙের ডোবা একটি। তার ওপর সাদা মেঘের ছায়া পড়েছে। কঞ্চি হাতে একটি ছোট্ট ছেলে অবাক হয়ে তাকিয়ে আছে ট্রেনের দিকে। পাট-বোঝাই একটি গরুর গাড়ির চাকা আটকে গেছে। গরুটি ধবধবে সাদা। একসময় নজমুল চাচা বললেন, 'ছি মা, কাঁদে না।'

বিলু,

তোর দুটি চিঠিই পেয়েছি। প্রথমটির জবাব সঙ্গে সঙ্গে লিখেছিলাম। রমজান ভাইকে পোস্ট করতে দিয়েছি। ওমা, দুই দিন পরে দেখি তার বাজারের ব্যাগ থেকে চিঠি বেরুল! ভিজে ন্যাতা ন্যাতা। অথচ রমজান ভাই আমাকে বলেছে সে নিজ হাতে চিঠি ফেলেছে। দেখ অবস্থা! তারপর তোমার দু'নম্বর চিঠিটি এল। ভাবলাম রাতে জবাব লিখব। রাত ছাড়া চিঠি লিখতে ভাল লাগে না। কিন্তু রাতে বাবার খুব জ্বর এল। মাথায় পানি ঢালতে হল, ডাক্তার আনতে হল। ডাক্তার বলছেন ম্যালেরিয়া। দেশে কি এখন ম্যালেরিয়া আছে নাকি যে ম্যালেরিয়া হবে! ডাক্তারটির বয়স খুব কম, আমার মনে হয় নতুন পাস করেছে। আমার মত পাস। বইটই ভালমত পড়েনি। আমার সঙ্গে গম্ভীর হয়ে কথা বলছিল।

'মিস নীলু, ভয়ের কিছু নেই। আমি আবার এসে দেখে যাব।'

আমি হেসে বাঁচি না। মিস নীলু আবার কী! কলেজে ওঠার পর দেখি অনেকেই সম্মান-টম্মান করছে। বিশেষ করে আমাদের কলেজের একজন লজিকের স্যার — নজিবর রহমান ভুঁইয়া। উনি সব সময় আপনি আপনি করছেন। ছাত্রীরা তাঁর নাম দিয়েছে প্রেমকুমার। কারণ, তিনি নাকি সব মেয়ের সঙ্গে প্রেম করবার চেষ্টা করেন। তাঁকে প্রতি বছর পাঁচ ছ'বার হাফসোল খেতে হয়। হাফসোল কী জানিস তো? নাকি তোদের কলেজে এসব কথা বলে না?

যাই হোক, নজিবর রহমান স্যার কী করল তোকে বলি। ক্লাসের বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছি, হঠাৎ নজিবর রহমান স্যারের সঙ্গে দেখা। তিনি ভুরু কুঁচকে বললেন, 'তুমি ফার্স্ট ইয়ারের না?'

'জ্বি স্যার।'

'গত ক্লাসে আসনি কেন?'

'বাবার জ্বর ছিল তাই আসিনি।'

'লজিকের কতগুলি ইম্পর্টেন্ট ডেফিনেশন পড়িয়েছি। মিস করলে পরেরগুলি ধরতে পারবে না।'

আমি চুপ করে রইলাম। নজিবর রহমান স্যার গম্ভীরভাবে কিছুক্ষণ মাথা দুলিয়ে বললেন, 'ঠিক আছে আমার কাছে প্রিপেয়ারড নোট আছে। একবার এসে নিয়ে যেও।'

আমি অবশ্যি নোট নিতে যাই নি। গেলেই আমার নাম হয়ে যেত প্রেমকুমারী। হি-হি-হি। উঁচু ক্লাসের মেয়েদের কাছে শুনেছি তাঁর কাছে ক্লাস-নোটের দশ-বারোটা কপি তৈরি থাকে। যাদের সঙ্গে তাঁর প্রেম করার ইচ্ছে হয় তাদের তিনি ডেকে ডেকে দেন। ভদ্রলোক কিন্তু পড়ান খুব ভাল। আমাদের আরেকজন স্যার আছেন খুব ভাল পড়ান। তাঁর নাম কী জানিস? তাঁর নাম "মুরগির গু"। কী জন্যে বেচারার এই নাম হল কে জানে। অনেকদিন ধরে তাঁর এই নাম চলছে। ছোটখাট মানুষ, খুব পান খান। ক্লাস শুরু করবার

আগে ডাস্টার দিয়ে টেবিলে একটা প্রচণ্ড বাড়ি দিয়ে বলেন, 'নিস্তব্ধতা! ছাত্রীগণ, নিস্তব্ধতা হিরন্ময়!' প্রথম দিন তো আমি বহু কষ্টে হাসি সামলালাম, কিন্তু পরে দেখি সাংঘাতিক ভাল পড়ান। তাঁর একটা ভাল নাম হওয়া দরকার ছিল।

ক্লাসের অনেক কথা লিখলাম। আরো মজার মজার ব্যাপার আছে, পরে লিখব। একজন আপা আছেন, তাঁর নাম 'মিস চাটা'। দারুণ অসভ্য অসভ্য সব গল্প আছে তাঁকে নিয়ে। চিঠিতে লেখা যাবে না।

এবার অন্য খবর বলি। মুন্নির বিয়ে হয়ে গেছে। ছেলে পিডিবির ইঞ্জিনীয়ার। খুব নাকি বড়লোক। আমি অবশ্যি বিয়েতে যাইনি। কারণ, আমাকে যেতে বলেনি। মুন্নি ক্লাসের প্রায় সব মেয়েকে বলেছে, আমাকে বলেনি। রকিব ভাই এসেছিলেন ঢাকা থেকে। আমার অবশ্যি ধারণা ছিল আসবেন না। বিয়ের পরদিন আমাদের বাড়িতে এলেন। কখন এসেছেন আমি কিছুই জানি না। কী জন্যে যেন বসার ঘরে গিয়েছি, দেখি তিনি বসে বসে বাবার সঙ্গে গল্প করছেন। তাঁর গায়ে নীল রঙের স্ট্রাইপ দেয়া একটা শার্ট ছিল। এমন মানিয়েছিল তাঁকে কী বলব!

আমার গায়ে ছিল বোম্বে প্রিন্টের ঐ জংলী শাড়িটা। আমাকে নিশ্চয় ভূতের মতো লাগছিল। কারণ ঐ দিন আমি চুলও বাঁধিনি, কিছুই করিনি। আকবরের মাকে বলেছিলাম চুল বেঁধে দিতে। সে 'দিতাছি আপা' বলে সেই যে গিয়েছে গিয়েছেই। আর দেখা নেই। আমি গিয়ে দেখি দিব্যি ঘুমাচ্ছে। তারপর আমিও ঘুমাতে গেলাম। এখন চিন্তা করে দেখ অবস্থা! চুল বাঁধা নেই, ঘুমঘুম ফোলা মুখ, পরনে জংলী শাড়ি। কী ভাবলেন উনি কে জানে। আমিতো একদম হতভম্ব হয়ে গেছি। উনি বললেন, 'তুমি কে — নীলু না বিলু?'

আর বাবার যা কাণ্ড! বাবা বললেন, 'সালাম কর নীলু, সালাম কর।'

সালাম করব কী! আমি বললাম, 'আপনি বসুন, আমি হাত-মুখ ধুয়ে আসছি।'

'উঁহু, আমি বেশিক্ষণ বসতে পারব না।'

উনি অবশ্যি অনেকক্ষণ বসলেন। চা'টা খেলেন। যাবার আগে আমাকে দুটো বই দিয়ে গেলেন। একটা হচ্ছে — ঘনাদার গল্প (দেখ না কাণ্ড, ঘনাদার গল্প পড়ার বয়স এখন আছে?) অন্যটি হচ্ছে একটি কবিতার বই, নাম — পালক। আজ আর লিখব না, ঘুম পাচ্ছে।

নীলু

পুনশ্চ ঃ তোর সঙ্গে যে রকিব ভাইয়ের দেখা হয়েছিল ঢাকায় এই কথাটি তুই কোনো চিঠিতেই লিখিস নি।

প্রিয় আপা,

আমি তোমাকে চারটি চিঠি দিয়েছি, তুমি মাত্র দুটি চিঠির জবাব দিয়েছ। এরকম করলে আমি আড়ি নেব। তখন মজা টের পাবে। বাবার খুব অসুখ। ডাক্তার বলেছেন ম্যালেরিয়া। খুব দুর্বল হয়ে গেছেন। এখন আর বাইরে যান না। আর বাবা তাঁর প্রেসটা বিক্রি করে দিয়েছেন। কিন্তু কাউকে সেটা বলেননি। নজমুল চাচা এটা শুনে খুব রাগ করেছেন।

আরেকটা খুব খারাপ খবর আছে। আমার গানের স্যারের ছোট ছেলেটা পানিতে ডুবে মরে গেছে। ছেলেটার বয়স সাত। তার নাম দীপন। তুমি তাকে দেখেছিলে। তোমার মনে আছে। তবলা বাজিয়েছিল। তুমি বললে — ও মা, এইটুকু ছেলে আবার তবলা বাজায়! তোমার কলেজ কবে ছুটি হবে?

সেতারা

প্রিয় মা বিলু,

দোয়া নিও। তোমার বাবার অসুখের সংবাদ পাইয়াছি। এখন কিছুটা সুস্থ, তবে পুরাপুরি সারে নাই। চিন্তার কোনো কারণ নাই। ইতিমধ্যে তোমার লোকাল গার্জেন সফদর সাহেবের একখানি পত্র পাইয়াছি। তুমি নাকি তাঁহাকে বলিয়াছ — তুমি ছুটির দিনে হোস্টেলেই থাকিতে চাও। এটা ঠিক না। সফদর সাহেব অত্যন্ত সজ্জন ব্যক্তি। তাঁর কথা শুনিবে এবং সেই মতো চলিবে।

তোমার বাবার ব্যবসা কিঞ্চিৎ মন্দা যাইতেছে। তিনি খুব সম্ভব প্রেস বিক্রি করিয়া দিয়াছেন। কাজটা ঠিক হয় নাই। চালু প্রেস বিক্রয় করার কোনো প্রয়োজন ছিল না। তুমি কোনোরূপ চিন্তা করিও না। তোমাদের অন্য অংশটি ভাড়া দেওয়ার চেষ্টা করিতেছি। দুই একজনের সঙ্গে কথাবার্তা হইয়াছে। যে কোনো ভাড়াটেকে হুট করিয়া ঢুকানো ঠিক হইবে না, তাই বিলম্ব হইতেছে।

ভালো থাকিও ও ঠিকমত পড়াশুনা করিও।

তোমার চাচা
নজমুল ইসলাম

নীলু,

তোর চিঠি পেয়েছি আজ বিকেলে।

এখন রাত প্রায় এগারোটা। অনেক রাতে উত্তর লিখতে বসেছি, কারণ আমার রুমমেট কিছু লেখার সময় খুব বিরক্ত করে। ঘাড়ের কাছে মাথা এনে সে চিঠি পড়বে। আমি এতটুকুও পছন্দ করি না, তবু সে এটা করবেই। তার ধারণা, আমি কোনো ছেলেকে চিঠি লিখছি। আমার তো আর খেয়ে-দেয়ে কাজ নেই।

বাবার অসুখের খবর পেয়ে খুব খারাপ লেগেছে। এতদিনে সেরেছে নিশ্চয়ই। সব জানাবি। নজমুল চাচা লিখেছেন প্রেস বিক্রি হয়ে গেছে। শুনে যা ভয় লাগছে! এখন আমাদের চলবে কী করে? আজ সমস্ত দিন আমার এইসব ভেবে খুব খারাপ লেগেছে। তার উপর আজ বায়োলজি ল্যাব ছিল। আমাদের ডেমনেসট্রেটর একটা ব্যাঙ এনে ক্লোরফরমড করলেন। আমরা শুধু দূর থেকে দেখলাম। তারপর উনি সেটা কচ করে কেটে ফেললেন। ব্যাঙের হৃৎপিণ্ডটা তখনো লাফাচ্ছে। কী যে খারাপ লেগেছে!

বিকেলে হোস্টেলে ফিরে এসেও বমি-বমি লাগছিল। রাতে ভাত খাইনি। আমার রুমমেট তখন ফ্রেঞ্চ টোস্ট করে খাওয়াল। ওর একটা কেরোসিন কুকার আছে। খাটের নিচে লুকিয়ে রাখে। কারণ, হলে এইসব অ্যালাউ করে না। কিন্তু বেচারির খুব রান্নার শখ। কয়েক দিন আগে গাজরের হালুয়া বানাল। এটা বানানো যে এত সহজ তা জানতাম না। খেতেও খুব ভাল হয়েছিল। মেয়েটির নাম মালা। রাজশাহী থেকে এসেছে। অনেকরকম রান্না জানে। দারুণ স্মার্ট মেয়ে। হোস্টেল সুপারের পারমিশন না নিয়েই সে দু'দিন তার এক আত্মীয়-বাড়ি থেকে এসেছে!

এখানে নিয়মের খুব কড়াকড়ি। তবে সিনিয়র মেয়েদের বেলায় এতটা নয়। সিনিয়র মেয়েরা দোতলায় থাকে। ওদের সঙ্গে আমাদের তেমন যোগ নেই। ওরা অনেকরকম কাণ্ড-কারখানা করে। গত শুক্রবারে কী হয়েছে জানিস! রাত একটায় হঠাৎ শুনি দারুণ হৈচৈ হচ্ছে। পরে শোনা গেল দোতলার ক'টি মেয়ে প্ল্যানচেট করে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের

আত্মা নিয়ে এসেছে। সে আত্মা আবার কিছুতেই যেতে চাচ্ছে না। হোস্টেল সুপারটুপার এলেন। হুলস্থূল কাণ্ড!

তুই লিখেছিস, তোর রকিব ভাইয়ের সঙ্গে যে দেখা হয়েছিল সে সম্পর্কে কিছু লিখিনি। ইচ্ছে করেই লিখিনি। তুই আবারীকি ভাবতে কী ভাববি। যাক, এখন লিখছি। সেদিন কেমিস্ট্রি প্রাকটিক্যাল খাতা কিনতে ন্যুমার্কেটে গিয়েছি। আমার সঙ্গে আছে আমার রুমমেট মালা। সে চুল বাঁধার রাবার ব্যান্ড আর টিপ কিনবে। কেনাকাটা শেষ হবার পর আমরা ঘুরে বেড়াচ্ছি, হঠাৎ মালা বলল — দেখ, ঐ ভদ্রলোক তখন থেকে আমাদের পিছে পিছে আসছে আর মিচকি মিচকি হাসছে। আমি ঘাড় ঘুরিয়ে দেখি একজন দাড়িওয়ালা ভদ্রলোক। আমাকে তাকাতে দেখেই সে বলল — তুমি নীলু না বিলু?

আমি তখনো চিনতে পারিনি। তখন ভদ্রলোক রাগী গলায় বললেন — চিঠির জবাব দাওনি কেন? তখন চিনলাম। খুব অবাক হয়েছিলাম। এরকম দাড়িগোঁফ কল্পনাও করিনি। তারপর উনি আমাদের আইসক্রীম খাওয়াতে নিয়ে গেলেন। মালা কিছুতেই যাবে না। শেষ পর্যন্ত অবশ্যি গেল। তিনি সারাক্ষণই তোর কথা জিজ্ঞেস করছিলেন। তাঁর কী ধারণা জানিস? তার ধারণা — না, বলব না।

শোন নীলু একটা কথা — তুই ঐ ভদ্রলোককে বলবি উনি যেন দাড়িগোঁফ কামিয়ে ফেলেন। যা জঘন্য লাগছিল ওঁকে!

এই যা — একটা বেজে যাচ্ছে, শুয়ে পড়ি। কাল-পরশু আবার চিঠি লিখব।

বিলু

মা বিলু,

দোয়া নিও। নীলুর নিকট হইতে শুনিলাম তোমাদের দোতলার মেয়েরা প্ল্যানচেটে আত্মা আনিয়াছে। উহাদের সহিত কোনরূপ সম্পর্ক রাখিবে না। সবকিছু নিয়া ছেলেখেলা ভাল না।

তোমাদের উপরের তলায় নতুন ভাড়াটে আসিয়াছে। অতি সজ্জন ভদ্রলোক। স্বামী-স্ত্রী ও একটি ছেলে। ছেলেটি ঈষৎ দুরন্ত।

তোমার বাবার অসুখ অল্প বাড়িয়াছে। তবে চিন্তার কারণ নাই। শরীরের উপর অযত্ন ও অবহেলার এই ফল। কিছুদিন ভুগাইবে। আর সব সংবাদ ভাল। জনৈক লোক মারফত আমি মুক্তাগাছার কিছু মণ্ডা পাঠাইলাম। বন্ধুবান্ধব নিয়া খাইও। আর তোমাদের হোস্টেল সুপারিনটেনডেন্টের নিকট একটি পৃথক পত্র দিলাম। পত্রটি তাঁহাকে পৌঁছাইও এবং আমার সালাম দিও। ইতি।

তোমার চাচা
নজমুল ইসলাম

হোস্টেল সুপার।

জনাবা,

সবিনয় নিবেদন এই যে, জানিতে পারিলাম আপনার হোস্টেলের কতিপয় ছাত্রী প্ল্যানচেট না কী যেন করিতেছে। এইসব বিষয় নিয়া ঠাট্টা-তামাশা শুভ নয়। ছাত্রীর

অভিভাবক হিসাবে আমি চিন্তাযুক্ত আছি। আপনি যথাবিহিত ব্যবস্থা গ্রহণ করিয়া চিন্তামুক্ত করিবেন। আপনার নিকট এই আমার বিনীত প্রার্থনা। ইতি

নজমুল ইসলাম

আপা,

তুমি নীলু আপাকে এত লম্বা লিখেছ, আমাকে লেখনি কেন? আমি খুব রাগ করেছি। আর কোনোদিন তোমাকে চিঠি লিখব না। আল্লাহ্‌র কসম।

বাবার অসুখ খুব বেড়েছে। আর আকবরের মার হাতের আঙুলের নিচে ঘা হয়েছে নজমুল চাচা বলেছেন বেশি পানি ঘাঁটাঘাঁটির জন্যে এটা হয়েছে।

দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছে করিম সাহেব। ভদ্রলোক খুব মোটা। তাঁর ছেলেটি দারুণ দুষ্টু। এবং খুব ফাজিল। সে আমাদের কাঁচের জগটা ভেঙে ফেলেছে। ভেঙে আবার দাঁত বের করে হাসে। এমন ফাজিল!

সেতারা

পুনশ্চ ঃ আপা, তোমরা যে রবীন্দ্রনাথের আত্মা এনেছ সে কী করেছে? আমাদের ক্লাসের একটি মেয়ে বলেছে সেও নাকি প্ল্যানচেট করতে পারে। আমার বিশ্বাস হয় না, সে খুব গুল ছাড়ে। এইজন্যে আমরা তার নাম দিয়েছি গুলবাহার।

প্রিয় বিলু,

তোদের হোস্টেলের মেয়েরা ভূত এনেছে শুনে নজমুল চাচা খুব রাগ করেছেন। তিনি বলেছেন, তিনি হোস্টেল সুপার এবং প্রিন্সিপ্যালকে চিঠি লিখবেন।

আমাদের দোতলায় নতুন ভাড়াটে এসেছেন। তাঁর স্ত্রীর নাম নীনা। ভদ্রমহিলা নাকি-স্বরে কথা বলেন। প্রথম দিন বাড়িতে এসে বললেন — বাঁড়ি তো খুঁব বঁড়। তঁবে চাঁরদিকে খুঁব জঁঙ্গলা। আমি বহু কষ্টে হাসি সামলেছি। তবে ভদ্রমহিলা খুব ভাল। বাবার জন্যে স্যুপ করে পাঠান এবং খুব খোঁজখবর করেন। তবে ভদ্রমহিলার শুচিবায়ু আছে। রোজ তিন- চারবার ঘর ধোয়ামোছা করেন।

বিলু, তোকে এখন একটা কথা বলি — আমি রকিব ভাইয়ের একটা খুব চমৎকার চিঠি পেয়েছি। এত সুন্দর চিঠি যে আমি খুব কাঁদলাম। কত লক্ষ বার যে পড়লাম সেই চিঠি। আমার কী ইচ্ছে করে জানিস? ইচ্ছে করে একদিন হুট করে ভদ্রলোকের বাড়িতে গিয়ে তাঁকে খুব চমকে দিই। তারপর তিনি যখন বলবেন — তুমি কে, নীলু না বিলু? আমি তখন বলব, আমি বিলু। এবং অনেকক্ষণ বিলু হিসেবে কথাবার্তা বলার পর হঠাৎ বলব, আমি কিন্তু নীলু। ভদ্রলোকের মুখের অবস্থাটা কী হবে ভেবে দেখ।

বিলু, ঐ ভদ্রলোকের সঙ্গে কী করে আমার পরিচয় হল তোকে বলি। মুন্নিদের বাসায় বেড়াতে গিয়েছি। অপলারাও গিয়েছে। মুন্নি বলল, 'আমার এক ভাই এসেছেন, ইউনিভার্সিটির টীচার। অঙ্কের টীচার, যা গম্ভীর! আমরা আড়াল থেকে দেখলাম, সত্যি গম্ভীর। মুন্নি তখন করল কি জানিস? আমাকে বলল — এই নীলু, তুই যদি আমার ঐ ভাইয়ের কাছ থেকে একটা সিগারেট নিয়ে খেতে পারিস তো বুঝব তোর সাহস। আমি বললাম — আমি শুধু শুধু তাঁর কাছ থেকে সিগারেট নিয়ে খাব কেন?

তুই তো টেনেছিস সিগারেট। স্কুলের বাথরুমে। এখন দেখি তোর সাহস। যদি সিগারেট চাইতে পারিস তা হলে প্রমাণ হবে আমাদের ক্লাসে তোর চেয়ে সাহসী মেয়ে

নেই।

আমি ইতস্তত করে ঢুকে পড়লাম ভদ্রলোকের ঘরে। কোনোমতে বললাম — মুন্নির সঙ্গে আমার একটা বাজি হয়েছে। সেই বাজিতে আমি জিতব, যদি আপনি আমাকে একটা সিগারেট দেন।

ভদ্রলোক কিছুই বুঝতে পারলেন না, তবে একটা সিগারেট বের করে দিলেন। আমি বললাম, 'আপনি রাগ করবেন না। সিগারেটটা আমাকে ধরাতে হবে।' ভদ্রলোক দিয়াশলাই বের করে দিয়ে অবাক হয়ে তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। নরম স্বরে জিজ্ঞেস করলেন, 'তোমার নাম কী?'

'নীলু।'

'ও, নীলু। তোমার কথা বলেছে আমাকে মুন্নি।'

'কী বলেছে?'

'বলেছে যে তুমি খুব তেজী মেয়ে।'

'আরো অনেক কিছু বলেছে নিশ্চয়ই।'

ভদ্রলোক তাকিয়ে রইলেন আমার দিকে। আমি বললাম, 'আর কিছু বলে নি মুন্নি?'

'আর কী বলবে?'

'বলে নি আমার মা পালিয়ে গেছে? আমাদের সম্পর্কে যখন কেউ কিছু বলে সেটাই সবার আগে বলে।'

ভদ্রলোক চুপ করে রইলেন। আমি বললাম, 'মুন্নি বলেনি সেসব?'

'বলেছে।'

আমি দেখলাম জানালার আড়াল থেকে মুন্নি ও অপলা অবাক হয়ে দেখছে আমার হাতে জ্বলন্ত সিগারেট।

আমি বললাম, 'আজ উঠি। আপনি আমার ওপর রাগ করেননি তো?'

'রাগ করব কেন?'

'আপনার সামনে সিগারেট টানলাম যে!'

'না, রাগ করিনি। মাঝে মাঝে এইসব ছেলেমানুষি দেখতে ভালই লাগে।'

আমি উঠে দাঁড়াতেই ভদ্রলোক বললেন — নীলু বসো, তোমার সঙ্গে কথা বলতে বেশ ভাল লাগছে। প্লীজ বস। আমি অবাক হয়েই বসলাম। আর আমার কী যে ভাল লাগল। এখনো মনে আছে সে রাতে অনেক রাত পর্যন্ত ঘুমুতে পারিনি। শেষ রাতের দিকে ঘুম এল এবং আমি ঐ ভদ্রলোককে স্বপ্নে দেখলাম। যেন আমি চা বানাচ্ছি, তিনি এসে বললেন — নীলু, আমার আজ ফিরতে দেরি হবে, তুমি খেয়ে নিও। অপেক্ষা করবার দরকার নেই। আমি রাগের ভঙ্গি করে বললাম — না, আজ কোথাও যেতে পারবে না। আজ আমরা বাগানে হাঁটব।

অদ্ভুত মিষ্টি স্বপ্নের ভেতরই আমি কেঁদে বুক ভাসিয়েছি। কাউকে এই স্বপ্নের কথা বলতে পারিনি। তোকে বলার ইচ্ছে হয়েছে, কিন্তু সাহস হয়নি। যদি তুই হাসাহাসি করিস!

তোকে আমি অনেক কথা বলতে চাই বিলু। ছুটি হতে তো অনেক দেরি। একবার চলে আয়-না। তা ছাড়া এম্নিতেও তোর আসা উচিত। বাবার শরীর খুব খারাপ, কেউ তোকে জানাচ্ছে না। কাল রাতে আমি ঘরে ঢুকতেই বাবা বললেন, 'কে, রেণু?' আমি

বললাম — 'বাবা, আমি নীলু।' বাবা কেমন চোখে তাকালেন আমার দিকে, তারপর বললেন — 'নীলু, তোর মা বোধহয় এসেছে। বসতে-টসতে দে। পুরোনো কথা মনে রেখে লাভ নেই।'

বিলু, চলে আয়।

তোর
নীলু।

বাড়ি ফিরে অবাক হলাম।

সবকিছুই অন্যরকম লাগছে। চারদিকে কেমন যেন অন্ধকার অন্ধকার। সবকিছুই অন্যরকম হয়ে গেছে। সেতারাকেও মনে হল এই তিন মাসে অনেকখানি বড় হয়ে গেছে। সবচে বদলেছেন বাবা। কী যে খারাপ হয়েছে তাঁর স্বাস্থ্য! চোখ হলুদ। মাথার সামনের দিকের চুল সব পড়ে গেছে। আমি তাঁর ঘরে গিয়ে ঢুকতেই তিনি বললেন, 'কে, রেণু?'

আমি অনেকক্ষণ অবাক হয়ে তাঁর দিকে তাকিয়ে রইলাম। তারপর বললাম, 'বাবা, আমাকে চিনতে পারছেন না?'

'চিনতে পারব না কেন? কখন এসেছিস?'

'এই তো কিছুক্ষণ আগে।'

'বস মা আমার কাছে।'

বাবা তাঁর রোগা একটা হাত আমার কোলে তুলে দিলেন।

'আপনি আমাকে একটা চিঠিও লেখননি বাবা।'

'শরীরটা খারাপ মা। খুব খারাপ।'

ঠিক তখন নীলু চা নিয়ে ঢুকল। বাবা মাথা তুলে বললেন, 'কে, রেণু?'

নীলু অত্যন্ত যত্নে বাবাকে বালিশে হেলান দিয়ে বসাল। পিরিচে ঢেলে ঢেলে চা খাওয়াল। নীলু দেখি অনেক কাজ শিখেছে। গিন্নি-গিন্নি ভাব।

সে কোমরে আঁচল জড়িয়ে ছুটোছুটি করে অনেক কাজ করছে। এক ফাঁকে বলল, 'সংসারের হাল ধরেছি।'

'তাই দেখছি।'

'কী যে ঝামেলা গেছে তুই তো জানিস না। তোকে কিছু জানানো হয়নি।'

'তা জানাবি কেন, আমি কে?'

'তাও ঠিক।'

নীলু হাসল।

আমি বললাম — 'তুই খুব সুন্দর হয়ে গেছিস নীলু।' নীলু কিছু বলল না। অন্য সময় হলে সে কিছু-একটা ঠাট্টার কথা বলত। আজ দেখলাম লজ্জা পাচ্ছে।

'নীলু, তুই কেমন অন্যরকম হয়ে গেছিস।'

'অন্যরকম মানে কীরকম?'

'তোর মধ্যে কেমন একটা মা-মা ভাব চলে এসেছে।'

নীলু লজ্জিত ভঙ্গিতে আবার হাসল। সত্যি সত্যি সে বদলে গেছে। কিন্তু এই নীলুকেও ভাল লাগছে। আমি মৃদু স্বরে বললাম, 'আজ রাতে আমরা দুজন এক সঙ্গে শোব, কেমন নীলু?'

'ঠিক আছে।'

'সারা রাত গল্প করব।'

নীলু হাসল। ছোট বোনদের পাগলামি কথাবার্তা শুনে বড় বোনরা যেমন প্রশ্রয়ের হাসি হাসে সেরকম হাসি। ওরা আমার ঘরটি ঠিক আগের মতো করে সাজিয়ে রেখেছে। টেবিলের ওপর বইপত্র যা ছিল সব সেরকমই আছে। একটা বাজারের লিস্ট করেছিলাম, সেই লিস্টটা পর্যন্ত ঝুলিয়ে রেখেছে।

'আমার বিছানায় এখন কে শোয় নীলু? সেতারা?'

'হুঁ, সেতারা বুঝি সেরকম? ও এখনো আমার সঙ্গে ঘুমায়। আরো অনেক মজার ব্যাপার আছে সেতারার।'

সেতারা বলল, 'ভাল হবে না আপা।'

আমি বললাম, 'কী ব্যাপার?'

'সেতারাকে কে যেন প্রেমপত্র লিখেছে। রুলটানা কাগজে।'

নীলু খিলখিল করে হেসে উঠল। কে বলবে এই বাড়িতে কোনো দুঃখকষ্ট আছে!

নীলু বলল, 'নজমুল চাচা তাঁর মেয়ের কাছে যাচ্ছেন, জানিস?'

'না তো!'

'সামনের মাসের মাঝামাঝি যাবেন। ওর মেয়ের কি যেন একটা অপারেশন হবে। গল ব্লাডার না কী যেন, ঠিক জানি না। মেয়ে বাবার জন্যে টিকিট পাঠিয়েছে।'

'নজমুল চাচা নিশ্চয়ই খুব খুশি?'

'না, খুব না। এত দূর একা একা যেতে ভয় পাচ্ছেন।'

'ভয়ের কী?'

'কী জানি! চাচার হেন-তেন কত কথা, আসলে যাবার ইচ্ছা নেই।'

'যাচ্ছেন তো?'

'তা যাচ্ছেন।'

নজমুল চাচার সঙ্গে দেখা করতে গেলাম। নজমুল চাচা আমাকে জড়িয়ে ধরে খুব কাঁদতে লাগলেন। যেন আমি তাঁর হারিয়ে-যাওয়া একটি মেয়ে, কোনোদিন ফিরে পাবেন ভাবেননি, হঠাৎ ফিরে পেয়েছেন। তাঁর কাণ্ড দেখে দরজার পাশে দাঁড়িয়ে নীলু হাসতে লাগল। চাচা রাগী গলায় ধমক দিলেন, 'হাসছিস কেন?'

নীলু মুখ টিপে বলল, 'এম্নি হাসছি। কাঁদলে দোষ নেই, হাসলে দোষ।'

'তুই নিচে যা তো নীলু।'

'ঠিক আছে যাচ্ছি। কিন্তু বিলু ভেবে যাকে জড়িয়ে ধরে কাঁদা হচ্ছে সে কিন্তু বিলু নয়। আমি বিলু।'

নজমুল চাচা হকচকিয়ে গেলেন। তীক্ষ্ণ চোখে তাকাতে লাগলেন। তাঁর মনে সন্দেহ ঢুকে গেল।

'তুই কে, নীলু না বিলু?'

'আমি বিলু।'

'সত্যি করে বল।'

'সত্যি বলছি।'

'না, তুই নীলু। বড় ফাজিল হয়েছিস, যা বিলুকে পাঠিয়ে দে।' আমি হাসতে হাসতে নিচে নেমে গেলাম। বাড়িতে এসে বড় ভাল লাগছে।

দোতলার নতুন ভাড়াটেদের সঙ্গেও দেখা হল। নীলু বলেছিল নাকি-স্বরে কথা বলেন। কোথায় কী, দিব্যি ভাল মানুষের মতো কথাবার্তা। নীলুটা এমন বানাতে পারে! ভদ্রমহিলাকে আমার বেশ পছন্দ হল। তবে একটু কথা বেশি বলেন। আমার সঙ্গে দু'-তিন মিনিট কথা হল, এর মধ্যে হড়বড় করে একশ' গণ্ডা কথা বলে ফেললেন। তবে যে সব মেয়েরা বেশি কথা বলে ওদের মনে কোনো ঘোরপ্যাঁচ থাকে না। এইটা খুব সত্যি। বেশি কথা-বলা মেয়েরা খুব দিলখোলা হয়।

সমস্ত দিন আমি অন্য একধরনের ভাললাগা নিয়ে ঘুরে বেড়াতে লাগলাম। দুপুরে নীলু আমাকে বাগানে নিয়ে গেল। পেয়ারাগাছে নাকি ডাঁসা পেয়ারা হয়েছে। খুব মিষ্টি।

'বাগান পরিষ্কার করেছে কে?'

'দোতলার ঐ ভদ্রমহিলা করিয়েছেন। এখন ভাল লাগছে না?'

'হুঁ। চমৎকার লাগছে।'

'ঐ ভদ্রমহিলা আর তার হাসব্যান্ড প্রায়ই সন্ধ্যাবেলা বাগানে বসে চা খান। একদিন দেখি হাত ধরাধরি করে হাঁটছেন। খুব রোমান্টিক।'

আমি ঘাসের ওপর বসতে বসতে বললাম, 'তোর রকিব ভাই আর চিঠি-ফিঠি লেখেন না?'

নীলু লাল হয়ে বলল, 'লেখে মাঝে মাঝে।'

'কী লেখেন?'

'এইসব আজেবাজে, তেমন কিছু না।'

'তুই নিশ্চয়ই খুব লিখিস?'

নীলু জবাব দিল না।

'কি রে, লিখিস না তুই?'

'লিখি মাঝে মাঝে।'

'তুই কী লিখিস নীলু?'

নীলু চুপ করে রইল।

'বল-না?'

'যা মনে আসে তাই লিখি। বাবার কথা লিখি, মার কথা লিখি। তোর কথা সেতারার কথা সবার কথা লিখি।'

'লিখতে খুব ভাল লাগে?'

'হুঁ।'

আমি একটি ছোট্ট নিঃশ্বাস গোপন করে হালকা স্বরে বললাম, 'তোদের বিয়ে হলে বেশ মানাবে। দুজনেই চিঠি লেখার ওস্তাদ।'

নীলু অন্যদিকে মুখ ফিরিয়ে নিল। হয়তো তার চোখে পানি আসছে। চাচ্ছে না আমি দেখে ফেলি।

১৩

সন্ধ্যাবেলা আমরা তিন বোন নদীর পাড়ে হাঁটতে গেলাম। মা যখন ছিলেন তখন আমরা প্রায়ই হাঁটতে আসতাম। প্রায় মাইলখানিক হাঁটা হয়ে যেত। একসময় ক্লান্তিতে পা ভারী হয়ে আসত, তবু মায়ের হাঁটার শেষ নেই।

নীলু বলত, 'আর পারব না। ক্ষমা চাই। আমি এখানে বসে থাকব, তোমরা যাও।' মা বলতেন, 'অল্প কিছুদূর যাব। সামনেই নদীটা খুব সুন্দর।' একই রকম নদী। একই দৃশ্য দু'পাশে। তবু কিছু কিছু জায়গায় দাঁড়িয়ে মুগ্ধ কণ্ঠে বলতেন, 'আহ্, কী সুন্দর!' তেমন বিশেষ সৌন্দর্যের কিছু আমরা দেখতে পেতাম না। কিন্তু মা'র মুগ্ধ ভাব আমাদেরও স্পর্শ করত। নীলু হাই তুলে বলত, 'মন্দ না, ভালই।' মা চলে যাবার পর আমরা আর নদীর কাছে আসিনি। না, কথাটা ঠিক না। বাবার সঙ্গে এসেছিলাম একদিন। গত শীতের আগের শীতে বাবার হঠাৎ শখ হল আমাদের নিয়ে বেড়াবেন। খুব উৎসাহের সঙ্গে বললেন, 'ফ্লাস্কে করে চা নিয়ে যাব। নদীর পাড়ে বসে চা খাব, কী বলিস?' আমরা কেউ তেমন উৎসাহ দেখালাম না। শুধু সেতারা খুব উৎসাহ দেখাতে লাগল।

প্রচণ্ড শীতে কাঁপতে কাঁপতে আমরা বেড়াতে বের হলাম। বাবার কাঁধে ফ্লাস্ক। আমরা তিন বোন হাত ধরাধরি করে তাঁর পিছু পিছু যাচ্ছি। কুয়াশায় চারদিক ঢাকা। দেখার মতো কিছুই নেই। নদীটিও শুকিয়ে এতটুকু হয়ে গেছে। বাবার উৎসাহ মিইয়ে এসেছে। মৃদু স্বরে বললেন, 'ফিরে যাবি নাকি?' নীলু বলল, 'কোথাও বসে চা শেষ করি। এত কষ্ট করে ফ্লাস্কটা আনলে।' কোথাও বসার মতো জায়গা পাওয়া গেল না। সব শিশিরে ভিজে আছে। বাবা অত্যন্ত বিব্রত বোধ করতে লাগলেন। সেই আমাদের শেষবারের মতো যাওয়া।

বাবা সুস্থ থাকলে বাবাকে নিয়ে আসা যেত। তিনি আমাদের তিন বোনকে বেরুতে দেখে আগ্রহ নিয়ে বলেছিলেন, 'কোথায় যাচ্ছিস তোরা?' সেতারা বলেছে, 'নদীর পাড়ে হাঁটতে যাচ্ছি বাবা।' তিনি ছোট্ট নিঃশ্বাস ফেলে বললেন, 'ভাল, খুব ভাল।'

'বেশিক্ষণ থাকব না। যাব আর আসব।'

'যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিস মা। আমার জন্যে ভাবতে হবে না। আমি ভালই আছি। খুব ভাল।'

আমরা হাঁটছি নিঃশব্দে। অনেকেই কৌতূহলী হয়ে তাকাচ্ছে আমাদের দিকে। দু'একজন বুড়োমত ভদ্রলোক সেতারাকে জিজ্ঞেস করলেন, 'ভাল আছ?'

নীলু বলল, 'সেতারাকে সবাই চেনে। ইস আগে যদি মন দিয়ে গানটা শিখতাম!'

আমরা হাঁটতে হাঁটতে শহরের শেষ প্রান্তে চলে এলাম প্রায়। সেখানে প্রকাণ্ড একটা ঝাকড়া রেন্টিগাছ। তার শিকড় নেমে গেছে নদীর দিকে। কয়েকজন কলেজের ছেলে-টেলে হবে, গাছের গুঁড়ির ওপর বসে সিগারেট টানছিল। ওরা আমাদের দেখেই উঠে দাঁড়াল। একজন এগিয়ে এসে বলল, 'আপনারা বসবেন?'

'নাহ্।'

'বসুন-না একটু আমাদের সঙ্গে। বসুন।'

সেতারা বলল, 'কিন্তু আপনারা গান গাইতে বলতে পারবেন না।'

সব ক'টি ছেলে একসঙ্গে হেসে উঠল। আমরা তিন বোন পাশাপাশি বসলাম। ছেলেগুলি বসল আমাদের সামনে।

নীলু বলল, 'আপনারা রোজ এখানে আসেন? জায়গাটা খুব সুন্দর।'

ছেলেগুলি কোনো উত্তর দিল না।

সেতারা বলল, 'সন্ধ্যা হয়ে আসছে। বাড়ি যাওয়া দরকার।'

'আমরা আপনাদের পৌঁছে দেব। আমরা "উত্তর দিঘির" পাশ দিয়েই রোজ যাই।'

আমরা বেশ খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। ছেলেগুলি সেতারাকে গান গাইতে বলল না। কিন্তু সেতারা নিজ থেকেই গুনগুন করতে শুরু করল। খোলা মাঠ। অদূরেই শীর্ণকায় ব্রহ্মপুত্র। সন্ধ্যা হয়ে আসছে। পাখিরা ডানা ঝাপটাচ্ছে গাছে গাছে। এর মধ্যে সেতারার কিন্নর কন্ঠ চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল —

চাহিতে যেমন আগের দিনে
তেমনি মদির চোখে চাহিও
যদি গো সেদিন চোখে আসে জল
লুকাতে সে জল করিও না ছল

আমাদের তিন বোনের চোখ ভিজে উঠল। আমরা কতগুলি অপরিচিত ছেলেকে সামনে বসিয়ে কাঁদতে শুরু করলাম। কান্নার মতো গভীর তো কিছু নেই। একজনের দুঃখ অন্যজনকে স্পর্শ করে না। কিন্তু একজনের চোখের জল অন্যকে স্পর্শ করে। ছেলেগুলি দেখলাম একে একে মুখ ফিরিয়ে অন্য দিকে তাকাচ্ছে। পুরুষরা তাদের চোখের জল মেয়েদের দেখাতে চায় না।

একটি ছেলে কোমল স্বরে বলল, 'আরেকটা গাইবেন?'

কোন অলৌকিক জগৎ থেকে সেতারার গান আসে? বুকের মধ্যে প্রচণ্ড কষ্ট নিয়ে শুনলাম সে গাইছে, 'নহে নহে প্রিয়, এ নয় আঁখি জল।'

ক্রমে ক্রমে সন্ধ্যা মিলিয়ে এল। ব্রহ্মপুত্রের ওপর দিয়ে উড়ে আসতে লাগল শীতল হাওয়া। অন্ধকার ঝোপগুলিতে চিকমিক করতে লাগল জোনাকি। ছেলেগুলি আমাদের বাড়ি পর্যন্ত এগিয়ে দিল। সেতারা বলল, 'ভেতরে আসবেন?'

'জ্বি না, জ্বি না।'

কিন্তু ওরা চলেও গেল না। গেটের বাইরে অন্ধকারে দাঁড়িয়ে রইল চুপচাপ।

একজন মৃদু স্বরে বলল, 'আপনার বাবার শরীর কি এখন ভাল?'

নীলু বলল, 'একটু ভাল।'

কিন্তু বাবার শরীর ভাল নয়। আমি জানি বাবা মারা যাবেন খুব শিগগিরই। মৃত্যু টের পাওয়া যায়। তার পদশব্দ ক্ষীণ কিন্তু অত্যন্ত তীক্ষ্ণ। বাবা মারা যাবার পরপরই আমরা একা হয়ে যাব। কেউ কি তখন এগিয়ে আসবে আমাদের কাছে? একমুখ দাড়িগোঁফ নিয়ে রকিব ভাই হাসিমুখে বলবেন — কে বিলু আর কে নীলু? গাঢ় ভালবাসার সুবিশাল বাহু প্রসারিত করবেন আমাদের দিকে। হয়তো করবেন, হয়তো করবেন না। এখানে কিছুই নিশ্চিত করে বলা যায় না।

১৪

বসবার ঘরে বাতি জ্বলছিল। আমরা ঘরে ঢুকেই দেখলাম আমাদের লাল রঙের সোফাটিতে মা বসে আছেন। কেমন অদ্ভুত একটি শান্ত বিষণ্ণ ভঙ্গি। মা মাথা নিচু করে বললেন, 'তোমাদের বাবাকে দেখতে এলাম। নজমুল সাহেব টেলিগ্রাম করেছিলেন।'

মার পরনে সাদার উপর নীল নকশার একটা শাড়ি। মাথায় আঁচল দিয়ে চুপচাপ বসে আছেন। বয়সের ছাপ পড়েছে চোখেমুখে। কপালের কাছে এক গোছা রূপালি চুল। তবুও কী চমৎকারই না লাগছে তাঁকে!

মা বললেন, 'তোমরা কেমন আছ?'

কেউ কোনো জবাব দিলাম না। মা কি আমাদের তুমি করে বলতেন, না তুই করে বলতেন কিছুতেই মনে পড়ল না।

'সবাই অনেক বড় হয়ে গেছ, এবং খুব সুন্দর হয়েছ সবাই। বসো। কথা বলি তোমাদের সঙ্গে।'

আমরা বসলাম।

মা বললেন, 'তোমরা নাকি নদীর পাড়ে গিয়েছিলে?'

আমরা সে কথার জবাব দিলাম না।

মা থেমে থেমে বললেন, 'কয়েকদিন আগে সেতারার গান শুনলাম রেডিওতে। বিশ্বাসই হয়নি আমার একটি মেয়ে এত সুন্দর গান গায়!'

সেতারা তাকিয়ে আছে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে। কিছু-একটা দেখতে চেষ্টা করছে মা'র মধ্যে। নিজের মনের ছবির সঙ্গে মিলিয়ে নিচ্ছে হয়তো।

'তুমি মা খুব নাম করবে। দেশের মানুষের ভালবাসা তুমি পাবে — এখনই অবশ্যি পেয়েছ, আরো পাবে।'

নীলু বলল, 'আপনি কখন এসেছেন?'

'কিছুক্ষণ আগে এসেছি।'

'বাবার সঙ্গে দেখা হয়েছে?'

মা ইতস্তত করে বললেন, 'না।'

'যান, বাবার কাছে যান। উনি আপনার জন্যে খুব ব্যস্ত হয়ে আছেন।'

মা নড়লেন না। বসেই রইলেন।

আমি বললাম, 'আসুন, আপনাকে বাবার কাছে নিয়ে যাচ্ছি।'

বাবার ঘরে ঢোকামাত্র বাবা তাঁর অভ্যাসমত বললেন, 'কে, রেণু?'

মা দরজার পাশে থমকে দাঁড়ালেন। বাবা বললেন, 'ভাল আছ রেণু?'

১৫

সেই রাতেই বাবার অসুখ বেড়ে গেল। বুকে হাত দিয়ে বহু কষ্টে টেনে টেনে শ্বাস নিতে লাগলেন। কথাবার্তা জড়িয়ে গেল। তবু একটু কোনো শব্দ হতেই মাথা তুলে বলতে লাগলেন, 'কে, রেনু?'

মা তাঁর এত পাশে দাঁড়িয়ে, কিন্তু তাঁকে চিনতে পারলেন না।

আমি চলে এলাম আমার ঘরে। নীলুর বিছানার ওপর দেখি একটি নীল খাম পড়ে আছে। রকিব ভাইয়ের লেখা চিঠি নিশ্চয়ই। নীলু হয়তো আজই পেয়েছে। রেখে দিয়েছে গভীর রাতে একা একা পড়বার জন্যে।

চারদিকে সুনসান নীরবতা। আমি বসে আছি চুপচাপ। আমার পাশেই ভালবাসার একটি নীল চিঠি। আমি হাত বাড়িয়ে চিঠিটি স্পর্শ করলাম। ঠিক তখনি নিচ থেকে একটি তীব্র ও তীক্ষ্ণ কান্নার শব্দ ভেসে এল।

মা কাঁদছেন।
